প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক :
কে. চক্রবর্তী
৪/৪ গভঃ কলোনী
রথতলা
কলিকাতা-৭০০০৫৬

মুদ্রক :
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
জুপিটার প্রিণ্টার্স
৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচী

জাঁতাচালক

শেখর যোশী

গোঁসাই সিং-এর সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছিল। ঝিলম নদীরও মেজাজ বদলানোর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। মেহাল গাছের ছায়া থেকে উঠে গোঁসাই আবার জাঁতাকলের কাছে গেল। তার কলের চুঙ্গিতে এখনও প্রায় সিকিভাগ গম আভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। চুঙ্গির দিকে তাকিয়ে সে ক্লান্তভাবে হাত দিয়ে গমগুলো নাড়াচাড়া করে দিল। তারপর জাঁতার পাথরের উপর থেকে ভাঙা গমগুলো একসঙ্গে করে একটা স্তুপ করে রাখল। কাজ সেরে যখন সে বেরিয়ে এল তখন আবার দেখল যে চুঙ্গির গম তার আগের সীমা থেকে একটুও নিচে নেমে যায়নি। জাঁতাকলের উপরের পাথরটা ঘড় ঘড় শব্দ করে আস্তে আস্তে ঘুরছে। কলের দরজাটা খুব নিচুতে, তার ফলে তাকে ঘাড় হেঁট করে বেরুতে হয়। এরজন্য তার মাথায় এবং হাতে খুব পাতলা আবরণের মত আটা লেগে গেছে।

একটা থামের গায়ে কাত হয়ে বসে সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'চুলোয় যাক। সকাল থেকে মাত্র এক মণ! এখন তো সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে, একেবারে অসহ্য....'

বাস্তবিকই অবস্থাটা অসহনীয়। জুন মাস এসে গেল তবু তো মেঘের কোন চিহ্ন নেই। অন্যান্য বছরে এই সময়ে ধানগাছ রোপন করা হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর ছোট নদীগুলো শুকিয়ে গেছে। মাঠে চাষ করা দূরে থাক, বীজধান বোনার জমিও জলের অভাবে হলদে হয়ে যাচ্ছে। বহুদিন হল ঝরণার জল না থাকাতে জলশক্তিচালিত জাঁতাকলগুলো বন্ধ হয়ে আছে। গোঁসাই অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান, কারণ তার কল কোশী নদীর উপর। কিন্তু বোঝাটানা টাট্টু ঘোড়ার মত কোশী নদীর স্রোত এখন মন্থরগতিতে বয়ে চলেছে।

জাঁতাকলের তলার দিকে মন্থনদণ্ড। তার মধ্য দিয়ে জল বয়ে যাওয়াতে একটা মৃদু শব্দ হয়ে থাকে। রাখালরা যখন মাখন তোলার জন্যে ঘোরায় তখন এর চেয়ে বেশী শব্দ হয়। গোঁসাই তার মিলিটারি প্যান্টটা হাঁটু অবধি তুলে জলে নিচু হয়ে নেমে গেল। যদি কোথাও কোন ফুটো থাকে তাকে মেরামত

করা যাবে কিনা দেখতে। অনাবৃষ্টির সময়ে একফোঁটা জলের দাম অনেক। একটা বাঁধ তৈরী করে সে সমস্ত জলের গতি ঘুরিয়ে মিল চালানোর কাজে লাগাল। তারপর জল ডিঙ্গিয়ে এসে মিলে ফিরে এল।

কিছু দূরে, মাথায় কিছু গম নিয়ে একটা লোককে মিলের দিকে আসতে দেখা গেল। গোঁসাই চিৎকার করে বলল, 'ওহে শোন! তোমার গম কিন্তু এখন ভাঙ্গাতে পারবে না। আগামী দুদিনে আমাকে অনেক গম ভাঙ্গতে হবে। তুমি বরং উমেদ সিং-এর কলে যাও।'

লোকটি তবু ভাসা করে গোঁসাই-এর দিকে এগিয়ে এল। আর খুব জোরে জোরে কথা বলতে লাগল, 'আমার আটার খুব দরকার। তুমি কি আমাকে অন্য লোকের আগে একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না?'

গোঁসাই একটু মুরুব্বির মত হাসল। লোকটির চিৎকার শুনে মনে হল, কল চলার শব্দে তার কানে যেন তালা ধরে গেছে। 'সকলেই খুব তাড়াতাড়ি চায় হে!' গলার স্বর একটু নিচু করে আবার সে বলল, 'অন্য জায়গায় দেখ, যদি হয়ে যায় ভাল।'

তারপর গোঁসাই আবার মেহাল গাছের নীচে বসে কলকের আগুন খুঁচিয়ে হুঁকা তৈরী করে ধোঁয়া ছেড়ে খেতে আরম্ভ করল।

জাঁতাকলের পাথরগুলো একটানা ঘুরতে ঘুরতে একই শব্দ করে চলেছে। গমগুলো গড়ানোর জায়গা দিয়ে ঠুক ঠুক শব্দ করে পড়তে লাগল। মন্থনদণ্ড সাঁ-সাঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগল।

এ ছাড়া চারপাশে আর কোন শব্দ নেই। কোশী নদীর জলও যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। গোঁসাই-এর মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল,—হাঁটু অব্দি জল কি কোন শব্দ করতে পারে? নদীর পাথরগুলো সব শুকিয়ে যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বিকেলের সূর্যের তাপে পাখিরাও সব নিশ্চুপ।

গোঁসাই ভাবতে লাগল, লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় না করে দিলে বোধহয় ভালো হত। গম ভাঙ্গাতে পারবে না—এই কথাটা ওকে না বললেও চলত গমভর্তি বস্তাগুলি দেখেই হয়ত সে চলে যেত। কিন্তু লোকটা এলে কিছুক্ষণ কথা বলে সময় কাটাবার সুযোগ তো পাওয়া যেত।

সময় সময় এই একা-একা ভাবটা তার মনের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কোশী নদীর নির্জনতা যত না তাকে কষ্ট দেয় তার চেয়ে নিজের একাকীত্বে সে বেশি অসোয়াস্তি বোধ করে। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে সে নিজের বলে ভাবতে পারে। একটা কোন পোষা জন্তুজানোয়ারও নেই তার। মানুষের

জীবনের কি কোন মূল্য আছে, যদি তার নিজস্ব বলতে কোন ঘর, স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে না থাকে ?

সে মিলিটারী প্যান্টটা হাঁটু থেকে নামাতে থাকে। জলে নামার সময় সেটা একটু ভিজে গেছে এবং তার গায়ে ভিজে প্যান্ট লেগে থাকাতে বেশ আরাম বোধ করছে সে। পুরোনো স্মৃতিগুলো একে একে তার মনে জেগে উঠছে। এতে তার একটু হাসি পেল। আর এই প্যান্টটা তাকে অনেক পুরোনো স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে!····বাস্তবিকই এই প্যান্ট তার একাকীত্বের প্রতীক। কিন্তু এইসব জিনিস নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন করে লাভ কি ? বরং তার চেষ্টা করা উচিত হাবিলদারের পায়জামা নিয়ে কোন চিন্তার স্থান মনে না দেওয়া।

হাবিলদার ধরম সিং মিলিটারি পায়জামা পরে প্রথম গ্রামে এসেছিল। ইস্ত্রি-করা এবং ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ভাঁজের পায়জামা পরে তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। পায়জামা পরবার ইচ্ছাই তাকে সৈন্যদলে ভর্তি হবার মানসিক ইন্ধন জুগিয়েছিল। বহু বছর সৈন্যদলে চাকরি করার পর যখন সে ছাড়া পেল তখন পায়জামার সঙ্গে একাকীত্বও তার জীবনে জড়িয়ে গিয়েছিল।

এই পায়জামার সঙ্গে আরও অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যেমন বলা যায়, যে সময়ে প্রথম ছুটি নিয়ে সে দেশে এল····

সেটাই ছিল তার প্রথম বাৎসরিক ছুটি। কোনাওয়ালা টুপি (যার উপর দুটো কুরকি আড়াআড়ি সাঁটা আছে) মাথায় ফুর্তিবাজদের মত লাগিয়ে সৈনিক দলের জামা প্যান্ট পরে সে এসে হাজির হল। আর এই সংবাদ পাইনবনে আগুন লাগার মত সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ছোটরা এবং বয়োবৃদ্ধরা সকলেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল। তার কাকার ঘর এবং বারান্দায় লাল এবং বেগুনে রং-এর কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত জায়গাতেই দর্শন প্রার্থীদের ভীড়। কিন্তু গোঁসাইয়ের চোখ যাকে খুঁজছিল সে কোথায় ?···

নদীর অপর পারের গ্রাম থেকে মোষিযের বাচ্চা খোঁজার অছিলায় পরের দিন মেয়েটি এল। ওই তো তার লছ্‌মা !

গোঁসাই প্রথমে ভাবলো, তার সঙ্গে দেখা করবে না। গ্রামের ছেলেরা তাকে একা থাকতে দিচ্ছিল না। তাদের চোখে গোঁসাই যেন একটা বিশেষ তারা। গ্রাম প্রধান নরসিং পর্যন্ত বলল, 'তার দেখাদেখি শবনিয়াসের চ্যাংড়া ছেলে তার ছেঁড়া টুপিটা কোনাকুনি করে পরেছে।

একদিন অনেক কষ্ট করে সে ছেলেদের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারল। সে দেখল লছ্‌মা বনের দিকে যাচ্ছে। ছেলেদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য

সেদিন সে বলেছিল, 'জানোয়ারের সন্ধানে সে বনে যাচ্ছে।' কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল পিছু নেওয়া। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে গোঁসাইএর হাঁটুর উপর মাথা রেখে লছমা পাকা, রসভরতি কাফল ফল খাচ্ছিল। গোঁসাই খেলাচ্ছলেতার হাতে হাত রেখে চাপ দেবার সময় রক্তেরমত লাল ফলের রস তার পায়জামার উপর ছিটকে পড়ল। 'কিছু মনে করোনা।' এই বলে ছিনাল মেয়েদের মত হেসে লছমা বলেছিল, 'তুমি পায়জামাটা ছেড়ে যাবে। আমি তা দিয়ে আমার একটা ব্লাউজ বানাবো।' বলে সে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ঘটনাটা অবশ্য বহুদিন আগের। গোঁসাই তার উত্তরে হেসে বলেছিল যে সে একটা ভেলভেটের ব্লাউজ তার জন্যে বানিয়ে দেবে।

গোঁসাই লছমাকে বিয়ে করবার জন্য তার বাবাকে অন্য লোক মারফত প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা তার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে বলেছিল, 'আরে, ওর জীবনটা তো সবসময় কামানের গোলার মুখে সুতোর মতো ঝুলছে, তার বিয়ে কি করে দেবো?'

কেউ কি কোনদিন ভেলভেটের ব্লাউজ লছমাকে দেবার জন্য কিনেছিল? হ্যাঁ, রামুয়া কিনেছিল। কারণ পাহাড়ের ওদিক থেকে এসে সে বিয়ে করেছিল লছমাকে। রামুয়ার বাবা-মা আগেই মারা গিয়েছিল, ভাই-বোন বলতেও তার কেউ ছিল না।

তার দলের সেপাই কিসান সিং-এর কাছে লছমার বিয়ের কথা শুনেছিল সে। একদিন শীতের সন্ধ্যায় তারা লাইন দিয়ে কোয়ার্টার মাষ্টারের গুদামের সামনে দাঁড়িয়েছিল তখন কিসান সিং কথায় কথায় বলেছিল কেন ছুটি বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল সে। 'আমাদের গ্রামের রাম সিং তার বিয়ের সময় আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল; বুঝেছ বন্ধু। মেয়েটা যেমন সুন্দরী তেমনি আমুদে। সত্যি, যেন আগুনের ফুলকি! লছমা না কি যেন নাম! তোমাদের গ্রামের কাছাকাছিই তো মেয়েটার বাড়ি।'

সেদিনটা ছিল মদ খাওয়ার দিন। গোঁসাই সিং সাধারণত আধ পেগের বেশি মদ খেতো না। কিন্তু ঐ সন্ধ্যায় সে দুপেগ রাম্ খেয়ে নানারকম অসভ্যতা করে ঘুরে বেরিয়েছিল। পরের দিন হাবিলদার মেজর ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছিল। সেই বিশেষ সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে সে এখনো মনে মনে গাল দেয়—'হারামী মেজর!'

ফৌজে যোগ দেবার ঠিক আগে সে যখন গ্রাম ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সব দিনের কথা তার মনে পড়ে। সে লছমার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিল।

'আমি গঙ্গানাথজীর নামে শপথ করছি তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব।' বলতে বলতে লছমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

পরে সে ভেবেছিল যদি কখনও লছমার তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন গঙ্গানাথ জীর কাছে তার পাপের জন্য তাকেপ্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে। কারণ ভগবানের কাছে মিথ্যে শপথ করলে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়। সে জানে না আর কোনদিন সে লছমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা! ছেলেবেলার খেলার সাথীরা সকলেই রুজি রোজগারের জন্য শহরের দিকে কাজের সন্ধানে চলে গেছে। তার আর গ্রামে ফিরে যেতে মন চায় না। লছমা সম্পর্কে কোন খোঁজখবর নেওয়াও তার পক্ষে খুব একটা উৎসাহের ব্যাপার নয়।

যতদিন সে সৈন্যদলে ছিল সে একবারের জন্যও গ্রামে ফিরে যায়নি। এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলি হওয়ার তালিকায় নায়েক গোঁসাই সিং-এর নাম সব সময় পয়লা নম্বরে থাকত। গোঁসাই সিং সবসময়েই বদলির জন্য নিজেই দরখাস্ত করত। পুরো পনের বছর সে গ্রামের বাইরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিল।

মাত্র কয়েকমাস আগে সে গ্রামে ফিরে এসেছে। পুরো পনের বছর চাকরির পর তার নাম সংরক্ষণ তালিকায় রাখা ছিল। যখন চাকরিতে প্রথম যোগ দেয় তখন মাথার চুল কালো ছিল। এখন চুলগুলো পাতলা এবং রুক্ষ হয়ে গেছে। সে লছমার জন্যেই তো বিয়ে করল না। তাই একক জীবন কাটাতে সে বাধ্য।

তার এই একাকীত্বের কেউ যদি অংশীদার হত তবে সে জীবনের প্রত্যেকটি বিশেষ ঘটনা নিখুঁতভাবে কথার মালার মত সাজিয়ে বলতে পারত। জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনটির ঘটনা পর্যন্ত বলার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু তার কথা শোনার মত বন্ধু কই? মহালগাছের ছায়ার নীচে, কোশী নদীর গরম বালিয়াড়ির মুখোমুখি বসে শুধু স্মৃতি রোমন্থন করে আর মিলের একঘেয়ে শব্দ শোনে।

গোঁসাই এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে দেখল বালিয়াড়ির উপর দিয়ে মাথায় এক বোঝা গম নিয়ে একটা মেয়ে মিলের দিকে আসছে।

মিলের একঘেয়ে শব্দের কিছু হেরফের শুনে সে ভেতরে ঢুকল। চুঙ্গির মধ্যে যে গমগুলো ছিল, সমস্তই চলে গেছে। সে চুঙ্গিতে একটা ছোট থলে থেকে গম উজাড় করে চাবি বন্ধ করে দিল। শব্দ বন্ধ হয়ে থলেতে আটা ভর্তি হল।

'আমার গমগুলো ভেঙে দেবে?' গোঁসাই তার পিছন দিক থেকে নরম স্বর শুনলো, 'সন্ধ্যেবেলায় খাবার মত একটুও আটা নেই।'

গোঁসাই বুঝল আগের দেখা সেই মেয়েটাই এসেছে। তার মাথার বোঝাটা

খুব ছোট। গলার স্বর খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। যে কাপড় দিয়ে সে গমের বোঝাটা বেঁধেছিল তার একটা দিক মুখের উপর পড়াতে গোঁসাই তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছিল না। সন্দেহ দূর করার জন্য তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা হল। কিন্তু তার বদলে সে গমের থলেগুলো আবার সাজাতে আরম্ভ করল। কাঠের চাবিটা আবার জাঁতার পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শব্দ করতে লাগল। শব্দটা গোঁসাই-এর মনে একই রকম সুর তুলতে লাগল।

মিলের ছোট ঘরের মেঝের চারদিকে আটা ছড়িয়ে আছে এবং আটার পাতলা আবরণ তার গায়ে মাথায় লেগে থাকায় তাকে বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছিল। মেয়েটিও তাকে চিনতে পারল না।

মেয়েটি আবার অনুরোধ করল। আর মাথায় বোঝা নিয়ে কড়া রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশিক্ষণ গোঁসাই চুপ করে থাকতে পারল না। উত্তর তাকে দিতেই হল, 'দেখ, পাহাড়ের মত গম জমে গেছে। অনেক সময় লাগবে এগুলো শেষ হতে।'

কোন কথা না বলে মেয়েটি ফিরে যাবার জন্য পা তুললো। আর ঠিক তখনই মিলঘরের মধ্যে থেকে গোঁসাই নিচু হয়ে বের হয়ে এল। পরিষ্কার আলোতে মেয়েটিকে দেখার পর তার তখন ওকে চিনতে আর ভুল হল নি। আরও একবার তাকে ভালো করে লক্ষ্য করল। তারপর নিজের গা থেকে আটা ঝেড়ে ফেলে সে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'লছমা!' মেয়েটি ততক্ষণে নদীর পাড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। 'লছমা', সে আবার চেঁচিয়ে ডাকল।

মেয়েটি পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি কি আমাকে ডাকছ?'

'হ্যাঁ, তোমার গম নিয়ে এসো। আমি ভেঙে দেবো।'

যাতে তার পরিচয় পেয়ে লছমা চমকে না ওঠে সেইজন্য, সে মেহালগাছের ছায়ার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। মিলঘরের মধ্যে তার মাথার বোঝাটা রেখে এসে লছমা তার মুখের ঘাম মুছে, বিশ্রাম নেবার জন্য ততক্ষণে গাছের ছায়া খুঁজতে লাগল। তারপর সে ডালিমগাছটার ছায়ার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ কাছাকাছি বিশ্রাম নেবার আর কোন জায়গা ছিল না।

যখন সে গোঁসাই-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন কৃতজ্ঞতা জানাতে তাকে বলতে শোনা গেল, 'ভগবান তোমার বাচ্চাদের ভালা রাখুন। তুমি আমার খুব উপকার করলে। আর কোন কলে আমার গম ভাঙ্গানো যেত না।'

অজাতপুত্রদের উপর স্বয়ং লছমার শুভেচ্ছা শুনে গোঁসাই খুব কৌতুক বোধ করলেও মনের ভাবটা সে গোপন রাখল। তার দিকে লছমাকে তাকাবার

সুযোগ না দিয়ে, সেও প্রত্যুত্তরে বলল, 'তোমার বাচ্চারা দীর্ঘজীবী হোক। বাপের বাড়িতে তুমি কবে ফিরে এসেছ, লছমা।'

ডালিমগাছের ছায়ায় বসে লছমা চমকে উঠল। তারপর সে ভালো করে গোঁসাই এর দিকে তাকাল। যদি তার চোখের সামনে ধীর গতিতে চলা কোশী নদীতে হঠাৎ বান ডাকতো, সে বোধহয় তাতে অতটা অবাক হয়ে যেত না। বাস্তবিকই এই কি সেই গোঁসাই! যাকে সে বহুকাল চিনত।

'এ কী তুমি?'....সে অনেক কিছু বলতে চাইল। কিন্তু স্বর বেরুল না।

'হ্যাঁ, আমি গতবছর সৈন্যদল থেকে অবসর নিয়েছি। সময় কাটাবার জন্যে আমি এই মিলটা চালাই।' মনের অসহ্য যন্ত্রণাটা চাপবার জন্যে সে মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল। একটু থেমে গোঁসাই আবার বলল, 'তোমার বাচ্চারা ভালো আছে তো?''

চোখ না তুলে লছমা শুধু মাথা নাড়ল। তারপর একটা ডালিমফুল তুলে তার থেকে একটা একটা করে পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগল। আর হুঁকোর জন্যে যে আগুন ছিল, গোঁসাই তা অন্যমনস্কভাবে উস্কে দিচ্ছিল।

তবু কিছু একটা বলার জন্যে গোঁসাই আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বাপের বাড়িতে কতদিন আছ?'

লছমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। গোঁসাই শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারছিল না এখন তার কী করা উচিত। বিয়ের চিহ্ন হিসাবে মেয়েরা বিশেষ হার পরে। সে দেখল তার গলায় কোন হার নেই। এর থেকেই মনে হয় যে সে বিধবা হয়েছে। নিজের উপর ধিক্কার দিল কেন সে কিছু না দেখেই প্রশ্ন করল।

তাদের দেখা এত অকস্মাৎ ঘটে গেল যে বহুদিনের সঞ্চিত কত কথা যা তারা বলবে ভেবেছিল তা যেন স্মরণে এলো না। লছমা ঠিকই বুঝেছিল, গোঁসাই তাকে আজও ভুলতে পারেনি। তাই সে এবার সাহস করে নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল। আর গোঁসাই তা একমনে শুনতে লাগল। 'ভগবান যাকে পরিত্যাগ করে, প্রত্যেকে তাকে ভুলে যায়।' লছমা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'আমার দেওর এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। তাই আমি মার কাছে চলে এলাম। কিছুদিন আগে মা-ও মারা গেছে। একটি ছোট ছেলে আমার—সেও আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যদি আমার ছেলে না থাকত কোমরে পাথর বেঁধে কোশীতে ডুবে মরতাম।'

'তুমি কী এখন তোমার কাকার সঙ্গে থাকো?' গোঁসাই জিজ্ঞাসা করল।

'খারাপ সময় তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে আসবে না। পৃথিবীতে এটাই নিয়ম। কাকার নজর ছিল আমার বাবার সম্পত্তির দিকে। তাঁর ভয় ছিল আমি যদি তাঁর কাছ থেকে সব নিয়ে নি, আমি কিন্তু পরিষ্কার বলেছিলাম, সম্পত্তির উপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি ক্ষেতে কাজ করে নিজের ভরণপোষণ করতে পারব। কারুর চোখের কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না।'

ডালিমগাছের গুঁড়ির উপর হেলান দিয়ে লছমা পা জোড়া করে বসল। পনের বছর চলে গেছে, লছমার মুখে পড়েছে বয়সের ছাপ। তবু তার বিধ্বস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে গোঁসাই পনের বছর আগেকার সেই কিশোরী লছমাকে খুঁজতে চেষ্টা করল। 'এ বছর গরম অসহ্য!' লছমা প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বলল।

গোঁসাই বসে তাকে লক্ষ্য করছিল। ডালিমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো তার চুলের উপর খেলা করছিল।

'যদি তুমি মনে কর সূর্যের তাপ খুব বেশি, তাহলে এই গাছের ছায়ায় বসতে পার।' এই কথা বলে গোঁসাই উঠে দাঁড়াল।

'কেন? এখানে তো ভালোই বসেছি।' লছমা বলল।

চুঙ্গির ভেতরের গম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। গোঁসাই লছমার বোঝা তুলে গমগুলো চুঙ্গির মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর তার লাগোয়া আর একটা জাঁতাকলে গিয়ে কিছু পিতলের এবং অ্যালুমিনিয়ামের বাসন নিয়ে এল।

কিছু কাঠ জোগাড় করে আগুন জ্বালাল তারপর পোড়া কেটলিতে জল চাপিয়ে দিল। 'চায়ের সময় এক্ষুনি হয়ে যাবে।' সে লছমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'জল ফুটলে চায়ের পাতা দিও। ঠোঙাটা ওইখানে আছে।'

লছমা উত্তর দিল না। গোঁসাই বালির পাড় ধরে নদীর দিকে হাঁটতে লাগল আর সে তাকে দেখতে লাগল। রাস্তার ধারের দোকান থেকে দুধ আনতে তার খুব কম সময় লাগল। ফিরে আসার পর সে দেখল একটা ছ বছরের ছেলে লছমার পাশে বসে রয়েছে।

'এক মিনিটের জন্যও ছেলে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না।' ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলল, 'আমাকে বিরক্ত করতে ঠিক খুঁজে বের করেছে।'

গোঁসাই দেখল তার চোখ এড়িয়ে ছেলেটি সব সময় মাকে কিছু একটার জন্যে আব্দার করছে। 'চুপ করে বসো তো।' অবশেষে তার মা তাকে ধমক দিল, 'আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবো। একটু ধৈর্য ধর।'

চায়ে দুধ মিশিয়ে গোঁসাই আবার জাঁতাকলে ঢুকল। সে কিছুটা আটা নিয়ে

বেরিয়ে এসে উবু হয়ে নদীর ধারে বসে আটা মেখে লেচি পাকিয়ে ফেলল।

লছমা চা তৈরী করে ফেলল এবং গোঁসাই একটা গ্লাস, একটা মগ এবং টিনে চা-টা ঢেলে ফেলল। তারপর ভাঙ্গা উনুনে রুটি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চায়ের গ্লাস পাশে সরিয়ে রেখে লছলা রুটি করবার জন্যে এগিয়ে এল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যে গোঁসাই তাকে কোন ব্যাপারেই না বলতে পারবে না। মচ্ মচে, ফোলা বাদামী রঙের রুটিটা হল। গোঁসাই এইরকম রুটি বহুদিন খায়নি। সৈন্যদলে থাকাকালীন মেসে কিংবা নিজের হাতে বানানো রুটির চেয়ে এর স্বাদ একেবারে ভিন্ন। লেচি বানানোর সময় লছমার হাত তাড়াতাড়ি চলছিল ও চুড়িগুলি ঝুন ঝুন করে বাজছিল।

লছমা গোঁসাইএর উদ্দেশ্যে বলল, 'রুটি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চা গরম থাকতে থাকতে রুটি খেয়ে নিলে ভালো হয়।'

'এগুলো ছেলের জন্যে। আমার খাবার অত তাড়া নেই।'

লছমা প্রতিবাদ করে বলল, 'ও খাবার খেয়েছে। এখানে আসার আগে আমি তাকে কিছু খাইয়ে এনেছি।'

বাচ্চাটা খুব মনযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছিল। এবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। উত্তেজিত হয়ে সে বলল, 'মা কি বলছ, বাড়িতে রুটি ছিল না।'

'চুপ কর হতভাগা!' লছমা রেগে ছেলের দিকে তাকাল। তারপর লজ্জায় সারা শরীরের রক্ত মুখে জমা হল।

'ছেলের উপর রাগ করো না। সময় পেরিয়ে গেলে বাচ্চাদের খিদে পায়।, এই বলে গোঁসাই দুটো রুটি ছেলেটাকে দিল। ছোলটি লোভীর মত রুটির দিকে একবার চেয়ে মার দিকে তাকাল।

'নাও, খেয়ে নাও।' লছমা ছোট করে বলল, 'আমার লজ্জা হয়. ছেলেটাব স্বভাব দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অন্যের কাছে তা প্রকাশও হয়ে পড়ছে।'

গোঁসাই রুটির উপর একটু গুড় দিয়ে ছেলেটির হাতে দিল। ছেলেটি গুড় দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করল। গোঁসাই তা দেখতে লাগল এবং বাচ্চা ছেলের মুখে খাবার নিয়ে চোয়ালের নড়াচড়া কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছিল।

এই সংক্ষিপ্ত আকাশ আর পরিবেশ একটা মধুর আবহাওয়া সৃষ্টি করল এবং লছমাও তা বুঝতে পারছিল।

সে চায়ের মধ্যে একটুকরো রুটি ডুবিয়ে লছমার দিকে চাইল এবং হেসে বলল, "সত্যি মেয়েরা রুটি তৈরী করলে অন্য রকম স্বাদ হয়।' আবার হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমার কাছে যদি কিছু সব্জির তরকারি থাকত ছেলেটি বোধ হয় আর

একখানা রুটি খেত।' এই বলে সে অসহায়ের মত ছেলেটির দিকে তাকাল।

'ওর যেমন ভাগ্য! নাহলে আমাদের ঘরে জন্মাবে কেন? আমাদের দুদিন ধরে খাওয়া হয়নি। আজই কিছু রোজগার করেছি, সেই টাকায় জিনিস কিনব।'

গোঁসাই নিজের পকেটে হাত দিল। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে বলল, 'লছমা! এটা নাও।' হাত বাড়িয়ে সে লছমাকে দিতে গেল। 'আমার নিজের জন্য আরও আছে। আমি গত পরশু সরকারী ভাতা পেয়েছি।'

লছমা মাথা নাড়ল। 'টাকা লাগবে না—আমি ঠিক চালিয়ে নেব। এতটা খারাপ সময় এখনও আসেনি।'

টাকা নিতে অস্বীকার করায় গোঁসাই-এর মুখটা কুঁচকে গেল। 'মানুষের মহত্ত্ব বলে কিছু থাকে না যদি না সে অপরের অসময়ে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।' সে শুকনো গলায় বলল, 'আমি জীবনে বহু রোজগার করেছি এবং চিন্তা না করেই চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। প্রচুর টাকা, তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না। কি প্রয়োজনে লাগল? যদি তুমি কাউকে সাহায্য না কর তবে টাকার কোন মুল্য থাকে না। একেবারে মূল্যহীন, অনুর্বর মাটির মত।'

গোঁসাই-এর অবশ্য কোন যুক্তিই টিঁকলো না। লছমা অটল হয়ে রইল। সে আস্তে আস্তে ছেলের মাথায় মৃদু চাপড় মেরে, শান্ত দার্শনিকের স্বরে বলল, 'যদি গঙ্গানাথজী মুখ তুলে তাকান, কোন রকমে খারাপ দিনগুলো কেটে যাবেই। এই যে পেট, অনেকটা জাঁতাকলের চুঙ্গির মত। তুমি যত এর মধ্যে দেবে ততই তার দাবি বেড়ে যাবে। যদি লোকে একটু দরদ দেখায় বা কিছুটা সান্ত্বনাও দেয় তবে তাতেই কষ্টের অনেকখানি লাঘব হয়ে যাবে।'

গোঁসাই লছমার দিকে তাকাল। তার মনের সেই আগেকার উত্তাপ অনেক কমে গিয়েছে, সে এখন গভীর সমুদ্রের মত শান্ত।

জোর করে তাকে টাকা দিতে পারল না গোঁসাই। তারও মনে আগের দিনের মত জোর কই!....হতাশ হয়ে সে আবার জাঁতাকলের দিকে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা গিয়ে মিলের দরজার কাছে হঠাৎ সে পিছন ফিরে তাকাল। মিলের দিকে পিছন করে লছমা এখনও গাছের তলায় বসে আছে, এই তো কত কাছে! না, এখন আর কিছু হয় না। সব ফুরিয়ে গেছে। সে জাঁতাকলের ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে নিজের গমের ভাণ্ডার থেকে লছমার আটার সঙ্গে আরও কিছু আটা মিশিয়ে দিয়ে সাবধানে হাত পরিষ্কার করে বেরিয়ে এল। আরে, নদীতে তার দেওয়া বাঁধের কাছে কাউকে যেন ঘুরতে দেখল! 'ওখানে কে?' সে চিৎকার করে বলল। বোধহয় কেউ তার সযত্নে

তৈরী-করা বাঁধে ফাটল ধরিয়ে নিজের ক্ষেতের দিকে গোপনে জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল।

সে তাড়াতাড়ি লছমার কাছে এসে বলল, 'তোমার গম ভাঙা হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সে আস্তে আস্তে বলল, 'লছমা!'

লছমা তার আশ্চর্য টানা-টানা চোখ দুটো মেলে তার দিকে তাকাল। না, কিছুই সে বলতে পারল না।

'লছমা!' গোঁসাই ইতস্তত করে বলল, 'যখন তুমি কিছু টাকা রাখতে পারবে, গঙ্গানাথজীকে পূজো দিতে ভুলো না। তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো, প্রার্থনা জানিও আপনজনের মঙ্গল কামনা করে।'

আর অপেক্ষা না করে সে তাড়াতাড়ি বাঁধের দিকে চলে গেল। অনধিকার প্রবেশকারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার পর সে দূর থেকে দেখল লছমা তার আটার বোঝা মাথায় নিয়ে ছেলের হাত ধরে বালির পাড় ধরে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ না তাকে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ততক্ষণ গোঁসাই তাকিয়ে রইল। তারপর তার চোখে ঝাপসা হয়ে এল লছমার চেহারা!

কাঠের ছিপি জাঁতার পাথরের উপর পড়ে বেশ জোরে জোরে ঠকাঠক শব্দ করছিল। পাথরের চাকাগুলো ঘুরতে ঘুরতে একই সুরে শব্দ করে চলেছে। মন্থনদণ্ডটা জালের মধ্যে একটা হিস্ হিস্ শব্দ তুলেছে। এই নির্জনতার রাজ্যে শুধু একটা শব্দ গুমরে গুমরে আছড়ে পড়ছে তার বুকের মধ্যে।

ভালবাসা

মান্নু ভাণ্ডারী

রাত দশটা। ঝাড়ুদার শ্মশানের এক কোণে খাটিয়া টেনে এনে দরাজ গলায় গান ধরলো—'প্রেম বিনা এ জীবন যে কবরখানা'—এটা কবীরের একটা দোঁহা।

গান শুনে শ্মশানের চিতার মনেও যেন কেমন এক বেদনা জেগে উঠলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সামনের পাহাড়টার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার কি ইচ্ছে হয় না মানুষের মনের মত মন পেতে? মানুষ যেমন সবকিছু ভুলে ভালবাসে তেমনি করে কাউকে ভালবাসতে? কতদূর থেকে বাতাসে ভেসে আসে চিরন্তন প্রেমের কাহিনী। লয়লা আর মজনু, শীরিন আর ফারহাদ-এর অমর প্রেমের নির্যাস! আহা আমি যদি মজনু হতুম! মানুষের যখন সময় ফুরিয়ে আসে, এই পৃথিবীর সমস্ত দরজা তার কাছে বন্ধ হয়ে যায়, আমিই তখন হাত বাড়িয়ে তাদের ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিই। আমার কাছে কোন প্রভেদ নেই, কোটিপতি কিংবা ফতুর ভিখিরী, ঘাড় নড়নড়ে বুড়ো কিংবা বেসামাল মাতাল, সকলেই আমার কাছে সমান। তবুও মানুষ সম্পর্কে আমার মনে কোন দাগ কাটে না। মানুষ ভাবে আমি নিষ্করুণ চিতা যার বুকের আগুন আকাশ ছোঁয়।

শ্মশান আর শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা উন্নাসিক পাহাড়। সেটা একবার চিতার দিকে আর একবার শহরের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল।

চিতা মর্মাহত হল। 'মানুষেরও মনের অবস্থা যদি এমনি হয় তবে আমি একশবার মরতে রাজি আছি'। দৃঢ়তার সঙ্গে শব্দ করে সে বলল, 'আমার কাছে কোন ত্যাগই বড় নয়।' পাহাড়ের হাসিভরা মুখ আরও বিস্ফারিত হল। হঠাৎ বাতাসে একটা হৃদয়-বিদারক চিৎকার ভেসে এল।

কিছু লোককে শবাধার বহন করে শ্মশানের দিকে আসতে দেখা গেল। মিছিলের সামনে একটা স্বাস্থ্যবান যুবক। আকুল হয়ে সে কাঁদছে। মনে হচ্ছে সে পৃথিবীতে সবকিছু হারিয়েছে। শবাধারটার মধ্যে যুবকটির স্ত্রীর মৃতদেহ ছিল।

যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন তার সঙ্গীদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল তাকে ঐ জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

'ওহঃ, সে বৌকে কেমন পাগলের মত ভালবাসে।' চিতা নিজের

মনেই বলল, 'ওহ, আমি যদি এমন ভাবে কাউকে ভালবাসতে পারতাম।'

পরের দিন সন্ধ্যায়, যখন সূর্যের আলো পড়ে আসছে, সেই যুবকটিকে আবার শ্মশানে দেখা গেল। তার মুখ দেখে তাকে চেনা যাচ্ছিল না; সে এক বুড়ো হয়ে গেছে। কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

সে প্যাগলের মত ছোটাছুটি করে তাড়াতাড়ি স্ত্রীর পোড়া ছাই সংগ্রহ করতে লাগল। আর হঠাৎ একসময় সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলতে লাগল, 'সুকেশী, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কেন? তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে সারাজীবনেও আমাকে ছেড়ে যাবে না, কিন্তু আমাদের বিয়ের দুবছরের মধ্যেই তো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। তুমি আমাকে ডেকে নাও, সুকেশী! তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের কোন মানেই হয় না। কোন আনন্দ হয় না। তুমিই আমার জীবনের সব, আমার প্রাণ।' এই বলে সে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল। 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না, পারব না।' যুবকটি মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। চিতা হতভম্ব অবস্থায় তাকিয়ে রইল, তার মনের মধ্যে এমনি ভালবাসার ইচ্ছেটা জেগে উঠতে লাগল। চিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আহা, আমি যদি এই যুবকটির মত ভালবাসতে পারতাম।' পাহাড় হাসল।

কিছুক্ষণ পরে যুবকটি চলে গেল। চিতা যে দৃশ্য দেখল তা ভুলতে পারল না। ভালবাসার মৃত্যুতে যুবকটির অবস্থা দেখেছ? সে পাহাড়কে বলল—'প্রত্যেক-দিন অনেক অনেক আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথায় মানুষ এই শ্মশানে আসে কিন্তু শোকে কাতর এই যুবকটির মত আমি আর কাউকে দেখিনি। যতই চেষ্টা করি না কেন আমি একে কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি তোমাকে বলছি, ও বেশি দিন বাঁচবে না। একদিনের শোকে যার কঙ্কালের মত চেহারা হয়েছে, সে কি করে এই গভীর ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকবে! তার দিন হাতে গোনা যায়। আমার একান্ত কামনা সে মারা যাক, আমি আবার মিলন ঘটিয়ে দিতে পারব।'

পরদিন চিতা সেই যুবকের শবাধার আসবে এই বিশ্বাসে নিশ্চিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েকটি মৃতদেহ সেই শ্মশানে এল, কিন্তু তার মধ্যে ঐ যুবকটি ছিলো না। হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আবার যখন শ্মশানে অন্ধকারের ছায়া নেমে এল তখন সে এল। একই ভাবে কাতর হয়ে সারাক্ষণ ধরে সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তারপর বেশ কিছুদিন সে শ্মশানে আসা হঠাৎ বন্ধ করল। তবু চিতা তাকে মনে করে রেখেছিল। যত মরা মানুষ আসত সে উঁকি মেরে দেখত সেই যুবকটির মৃতদেহটা এসেছে কিনা। কিন্তু হতাশ হতে হত।

অবশেষে একদিন চিতা পাহাড়কে জিজ্ঞেস করল। তুমি শহরের চারদিক

দেখতে পাও? তুমি কি কোন জায়গায় ঐ যুবকটিকে দেখতে পাচ্ছ? পাহাড় হাসাল।

চিতা বলল, 'আমার মন বলছে সে আত্মহত্যা করেছে। বোধহয় সে নদীতে ডুবে মরেছে, সেইজন্যই তার মৃতদেহ দেখতে পাইনি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি তার স্ত্রীর সঙ্গে ওকে মিলিয়ে দেবার যোগসূত্র হব।'

পাহাড় বলল 'আমার মনে হয়না যে তোমার ধারণা সঠিক।'

চিতা বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি তো কেবল একটা কঠিন পাথরের স্তূপ।' পাহাড় হাসতে লাগল। আবার সে বলল, 'যে মানুষ দুঃখে এত কাতর, সে কি বাঁচতে পারে?' পাহাড় জোরে হেসে উঠল।

দিন যায়, মাস যায়, এমন কি বছরও পেরিয়ে গেল। যে সমস্ত লোক বিয়োগ ব্যথায় বুকভাঙ্গা কান্না কাঁদত, তাদের উপর চিতার সহানুভূতি ক্রমেই বাড়তে লাগল। চিতার একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়ালো, যারা প্রিয়জনের জন্য কাঁদত তাদের হৃদয়বোধের সে প্রশংসা করত। তার মনের পরিবর্তন দেখে পাহাড় হাসত।

তিন বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও চিতা ঐ যুবকের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। সে প্রায় যুবকদের কথা ভাবত, তার প্রিয়ার মৃত্যুর পর কান্নায় ভেজা সেই মুখটি তার চোখের উপর নিয়ত ভেসে উঠত। মনে হত তার স্ত্রীর মৃত্যুই কি তার আত্মহত্যার কারণ। যুবকের কান্না কানে বাজত।

একদিন একটা পরিচিত গলায় মর্মান্তিক কান্নার শব্দ শুনে সে হঠাৎ বিচলিত হল। একটা শবযাত্রার মিছিলের আগে সেই যুবকটি শ্মশানে ঢুকছে! 'লোকটা এখনও বেঁচে আছে!' চিতা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আবার কি দুর্ভাগ্যের শিকার হল!'

শববাহী লোকগুলোর কথায় চিতা বুঝতে পারল, মৃতদেহটি ঐ যুবকের স্ত্রীর।

'ওহঃ, লোকটার কি দুর্ভাগ্য!' শ্মশানযাত্রীরা বলছিল, পাঁচ বছরে দুটো স্ত্রী হারাল। অথচ এখনও তাকে কি রকম যুবক দেখায়!'

যুবকটি উচ্চস্বরে কাঁদছিল ফলে তাকে দেখে সকলেরই দুঃখ হচ্ছিল। লোকেরা তাকে খুব কষ্ট করে শ্মশান থেকে নিয়ে গিয়েছিল।

মানুষের স্বর্গীয় ভালবাসা সম্পর্কে চিতার এতদিন যে ধারণা হয়েছিল তা এই প্রথম একটা ধাক্কা খেল। সন্ধ্যায় যুবকটি শ্মশানে এসে শ্মশানের চারদিকে ঘুরতে লাগল আর স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। 'আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তুমি এইভাবে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।' সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা। তোমার সম্মোহিনী হাসিটুকু দেখে আমার প্রথম স্ত্রী সুকেশীকে ভুলতে পেরেছিলাম। তুমি আমার শরীর মন সব জয় করে নিয়েছিলে—তুমিই ছিলে প্রাণবায়ু। আমি এই পৃথিবীতে তোমাকে

হারিয়ে বাঁচবো কি করে! তুমি আমাকে টেনে নাও....সুকেশী আমার ভালবাসার সহচরী ছিল, সেজন্য তার বিচ্ছেদ কোনরকমে কাটিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী ছিলে। একই প্রাণ দুজনের দেহে একই ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে সুর তুলত। এখন সব সুর থেমে গেছে, আমার শরীর প্রাণহীন।'

প্রত্যেকদিন যুবকটি এসে কাঁদত তারপর চলে যেত। তার কান্না এমন নিখাদ ছিল যে মানুষের ভালবাসা সম্পর্কে যেটুকু সন্দেহ এবং অবিশ্বাস চিতার মনে দেখা গিয়েছিল তা আবার মুছে গেল।

চিতার মনে হল যুবকটি নিশ্চয় এই দুঃখের জ্বালায় মারা যাবে, মৃতদেহ শীঘ্রই এবার এখানে আসবে আর তাহলেই চিতার মনে ওদের মিলনকে চিরন্তন করে রাখার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু ঈপ্সিত মৃতদেহটি এল না।

সব জিনিসই নিজের পথে চলতে লাগল। কত মৃতদেহ রোজই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চিতা মানুষের প্রেমের জয়গান গাইত। তাই দেখে পাহাড় হাসত।

দু বছরও পার হল না; চিতা আবার তার পরিচিত কান্না শুনতে পেল। সেই যুবকটি তার তৃতীয় স্ত্রীর দেহ দাহ করতে এল। চিতা মনে করল যে এই বিয়েটা হয়ত ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে, ঠিক ভালবাসার আবেগে হয়নি। কিন্তু যখন যুবকটির কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল তখন সে নিজেই স্তব্ধ হয়ে গেল। যুবকটি খুব চিৎকার করে কাঁদছিল। তার চোখে জল, তরল লোহার মত কোন কিছুর বাধা না মেনে দুচোখ অন্ধ করে দিচ্ছিল। তার এখনকার চেহারা এবং আগের দেখা চেহারার মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। সে একই ভঙ্গিতে কাঁদতে কাঁদতে তৃতীয় স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও রূপের এমন প্রশংসা করছিল যা প্রথম দুটি স্ত্রীর মৃত্যুশোককে ছাপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলছিল, স্ত্রীকে ছাড়া বাঁচবে না।

মানুষের স্বর্গীয় ভালবাসা সম্পর্কে যে উঁচু ধারণা চিতা এতকাল মনে মনে পোষণ করত হঠাৎ সব তার কাছে প্রচণ্ড ঠাট্টা বলে মনে হল।' তার সমস্ত আবেগ পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে মুখটা তার বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত দেখাচ্ছিল।

চিতার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে এতদিনে পাহাড় বলল, 'তুমি একটা নিরেট বোকা। তুমি ভুলে যাও যে, যে মানুষ অপর কাউকে ভালবাসতে পারে সে সমানভাবে নিজেকেও ভালবাসে। সে শুধু মৃতের স্মৃতি নিয়ে থাকতে চায় না। সে অন্তসারশূণ্য কল্পনা নিয়ে কখনই বাঁচতে পারে না। সে জীবনকে পরিপূর্ণ-ভাবে ভোগ করার জন্য বার বার ভালবাসে এবং এই জন্যই সে বার বার প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা ভোগ করে। তার জন্য অপেক্ষা করে সীমাহীন শোকের সংসার—এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই!'

হঠাৎ-আলোর ঝলকানি

মোহন রাকেশ

দরজার ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে বচনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে পড়ল। ইরাবতী বোধহয় উঠোনের দরজা খুলছে। গনেশন পিয়ন বাড়ি ফিরে এল। তার মানে এখন নিশ্চয় সাড়ে ছটা। তার ক্লান্ত শরীরে কেমন এক ধরনের আলসেমি আর শূন্যতাবোধ জড়িয়ে রয়েছে। বিন্নী গতরাত্রে বাড়ি ফেরেনি। সারাদিন মনমরা হয়ে কেটেছে। এখন রাত্রি, তবু তার, ফেরার কোন চিহ্ন নেই। সে যে এই পোড়ো জায়গাটায় আছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিন্নী। এখানে সে প্রায় পরদেশী কারণ তার কথা কেউ বুঝতে পারেনা। এবং সেও কারুর কথা বোঝেনা। যদি একান্তই কথা বলতে হয় তবে ঐ গনেশন পিয়নের বৌ ইরাবতীর সঙ্গেই ভাঙ্গা হিন্দীতে একটু আধটু কথা বলা চলে। কিন্তু হিন্দীর সঙ্গে তায় মাতৃভাষা এমন ভাবে মিশে যায় যে কারুর পক্ষেই সহজবোধ্য হয়না। ইরাবতী অত্যন্ত সরল ভাষাতে বলেও যখন তার কথা বোঝাতে পারে না তখন মুখ কালো করে হতাশ হয়ে হাতদুটো ছড়িয়ে নিজের অক্ষমতা জানাতে থাকে। অথচ বিন্নীকে দেখ! সে দিনের বেলায় কি করে সময় কাটায় এবং তার অনুপস্থিতিতে সারারাত কিভাবে বসে থাকে তা কেউ বুঝতে চায়? না! তবে যদি বাড়ি ফিরতে মন চায় তবেই ফিরবে কিংবা সে যেখানে সারাদিন ছিল সেখানেই থাকবে। পরিবর্তিত অবস্থায় এটুকু স্বাধীনতা তার আছে। স্বাধীনতার জন্য কোন সংগ্রাম করতে হয়নি।

কূয়োর কাছে একটা শূকরী ছটা বাচ্চা দিয়েছে। কোনটাই ন ইঞ্চির বড় নয়। মরা তুঁতে গাছের কাছে শূকরীটা নর্দমায় মুখ দিয়ে দু একবার কী শুঁকলো, তারপর কয়েকবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে গাছের নীচে ময়লা জলের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। ছোট ছোট বাচ্চারা তার চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল এবং কখনও উঠে পড়ে আশপাশে তার মার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শূয়োর, চারদিকে শুধু শূয়োর। ছোট গলিটাতে শূয়োর কিলবিল করছে। এই পাড়ার বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের মাত্র দুটি পথ—শূয়োর পালন আর চোলাই মদ বিক্রি। জায়গাটা যদিও সান্তাক্রুজ এরারপোর্ট থেকে আট

মাইলের মধ্যে, তবুও এখানে যে কি হচ্ছে তা পুলিশ জেনেও চোখ বন্ধ করে থাকে। সকলের চোখের সামনে জ্যাকব, মণিকোর বাবা এই গলিতে আধিপত্য করত। পাড়ায় সে এক নম্বরের মাতাল। বেশির ভাগ সময়ই সে মদে চুর হয়ে থাকত, গলির একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত হাঁটত আর গান গাইত :

'ওগো আমার যদি পরীর মত হত দুটি ডানা,
আকাশ পথে যেতাম উঠে, ছড়িয়ে বড় পাখনা।'

অন্যান্য দিনের মত সেই সন্ধ্যায় সে টলতে টলতে কুয়োর পাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। সে যে কি গান গাইছে বচন কিছুই বুঝতে পারেনা। কিন্তু তার ভরাট গলায় ঐ ঘরঘরানি শব্দ শুনলেই বচনের ভয় লাগে।

'ওগো আমার যদি পরীর মত হত দুটি ডানা।
আকাশ পথে যেতাম উঠে, ছড়িয়ে বড় পাখনা।
যদি দেখতে পেতাম স্বর্গ পুরীর দ্বার....
আকাশ ভরা তারার আলোয় উধাও পারাপার....
ওহো হো....ওহো হো হো হো....'

উই-এ খাওয়া কাঠের মত গর্ত করা কোঁকড়ানো চ্যাপটা মুখের এবং লম্বা ঝুলের হলহলে কালো স্যুট পরা লোকটাকে ঐরকম অবস্থায় দেখলে কার না ভয় করে। তার গলার স্বর শুনেই বচন তাড়াতাড়ি দরজায় খিল এঁটেদিল। অনেকবার সে বিন্নীকে অন্য কোথাও বাড়ি পাল্টানোর কথা বলেছে। কিন্তু সে সবসময় তার অনুরোধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে যে বোম্বেতে কুড়ি টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো ঘর পাওয়া যায়না।

হ্যারিকেনের চিমনির তলার দিক ভুষো কালিতে ঢাকা পড়েছে। বচনের কিন্তু সেটা পরিষ্কার করার কোন আগ্রহ নেই। দিনগত পাপক্ষয়ের মত সে বাতিটাকে জ্বালাল, সলতেটাকে ছোট করে রেখে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে হাত জোড় করে হাঁটুর উপর রাখল। ভাঙ্গা চেয়ারের নীচে লাল্লির পোস্ট-কার্ডখানা পড়ে আছে। লেখাটা তার পরিচিত, কিন্তু সে পড়তে জানে না। বিন্নী চিঠিগুলো যেভাবে পড়ে শোনায় তা তার মোটেই পছন্দ হয় না। বিন্নী এক নিশ্বাসে চিঠিটা তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করে। তারপর সে এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নানা রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বসে। বড় ভাইয়ের চিঠি সম্পর্কে এমন ভাব দেখায় যে চিঠিটা যেন কোন অপরিচিতের কাছ থেকে এসেছে। বচন খুব দুঃখ পেত কিন্তু সে জানতো মাকে কিভাবে খুশী রাখতে হয়।

'মা, তোমার ছোট ছেলে খুব অলস এবং অভদ্র—তাই নয় কি?'

'না, না! সে প্রতিবাদ করে বলত, তুমি অলস ও অভদ্র?...তুমি আমার চোখের মণি।' এই বলে মা কপালে চুমো খেতো।

প্রায়ই বিন্নী যখন বাইরে রাত কাটাতো তার ভীষণ খারাপ লাগতো। ছোট বিবর্ণ দেয়ালটা তার চোখের সামনে থেকে মুছে যেত। সারা রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করত, মাঝে মাঝে তন্দ্রা ভেঙ্গে যেত, নানা রকম ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখত বলে সে সবসময় জেগে বসে থাকার চেষ্টা করত।

যখনই বিন্নী বাড়ি আসত, নিজের চিন্তায় সে মগ্ন থাকত। মা ভেবে পেত না ওর এমন কি দুঃখ যা তাকে দিনরাত ক্ষয় করে চলেছে। সে মাস্টারি করে মাসে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা রোজগার করত। কোন মাসে কিছু বেশি রোজগার হলেই কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব সে অনুভব করত। মা আমার দুটো সার্ট আর একজোড়া জুতো চাই। মার ঠোঁটে ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ত। মাত্র দশ টাকায় সে কি ভাবছে জগতটাকে কিনে নিতে পারবে? আবার যখন তার আয় কমে যেত তখনও অত্যন্ত সহজেই সমস্যার সমাধান করে দিত। মা, 'এই মাসে কোন শাকসবজি ও দুধ কেনা হবে না। শুধু ডাল, পিঁয়াজ এবং শুকনো রুটি, আর কিছু নয়, বুঝেছ? খুব উচ্চাশা ছিল তার। নিজের কাজের ধারাগুলো সকলের কাছে জোরে জোরে বক্তৃতা দিয়ে শোনাত। অথচ যেসব গোপন ইচ্ছা গুলো যে বাস্তবে রূপায়িত করার ইচ্ছা ছিল তা এই নির্মম পৃথিবীতে কোনদিনই রূপ পাবে না। 'মা, আমার কাজকর্ম সবই এই পেটের জন্যে।' সে উত্তেজিত হয়ে আঙ্গুল তুলে নিজের পেটে হাত দিয়ে বলল, 'হরিণের পেটে যেমন মৃগনাভি থাকে শুনেছ তো তেমনি আমারও যখন অবস্থার পরিবর্তন হবে তখন তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।'

বিন্নী আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত এবং অনেকদিন তার সঙ্গে এসে থাকত। সম্ভবত তাদের থাকবার কোন জায়গা ছিল না। একসঙ্গে খেতে বসে কোন রকম নিয়মকানুন সে মানত না। উনুনে রুটি করা শেষ হতে না হতেই কাড়াকাড়ি করে সে খেয়ে নিত। কিছুক্ষণের মধ্যে ডালের বাটি সাফ করে ফেলত! তাদের ব্যবহার বচনের খুব ভালো লাগত কিন্তু খিদে থাকা সত্ত্বেও যখন আর যোগান দিতে পারত না তখন নিজেকে তার অপরাধী মনে হত। সেই কারণে চোখে জল এসে গেলে নানা কাজের অছিলায় তা গোপন করে মুছে ফেলত।

বিন্নী এবং তার বন্ধুরা উত্তেজিত হয়ে নানা আলোচনা করত। আলোচনা করার সময় নানা যুক্তিতর্কের ঝড় তুলত, কেউ হার স্বীকার করত, কেউ বা

আপোষ করত এবং মনে হত সমস্ত জগতের মুক্তির দায়িত্ব তারাই যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে। ছেলেবেলায় বিন্নী তো বেশিরভাগ সময় চুপ করে থাকত। কিন্তু বর্তমানে ওর যুক্তিতর্কের ধারা দেখে বচন অবাক হয়ে যায়। তাদের চিৎকার এবং হাসির শব্দে বাড়ির ছাদ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হত। কিন্তু যখন তারা থাকত না তখন সমস্ত বাড়িটা কেমন নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকত। বচন সে সময়টা বেশ অসোয়াস্তি বোধ করত।

রাত গভীর হলে মণিকার মাতাল বাপটা নিজের ঘরে দরজা দিলে বচন আবার দরজা খুলত। শূকরী তার বাচ্চাদের নিয়ে সামনের বাড়ির বাগানে শুয়ে পড়েছে এবং একটা বড় শূয়োর নর্দমায় নাক ঘষছে আর মাঝে মাঝে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছে। বাইরে ঝোড়ো বাতাস বইছে; ঝড়ের দাপটে মরা তুঁতে গাছের শুকনো ডালগুলো খটখট শব্দ করছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সরু গলির আকাশটুকুতে তার রেশ দেখা যাচ্ছে। গত দু মাস ধরে প্রায় রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। গলিটা সবসময়েই কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে, ময়লা ঢিবি থেকে উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে।

দরজায় কে যেন ধাক্কা মারল। ইরাবতী দরজা খুলে দিলে বিন্নী হাসিমুখে ভেতরে ঢুকল।

'ভাবী, তোমাকে কষ্ট দিলাম বলে দুঃখিত।' বিন্নী বলল, 'বাড়ির সামনেটায় কী কাদা!' চুল এলোমেলো, সার্ট ও পায়জামা নোংরা হয়ে ওর গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। মনে হচ্ছে সে যেন সকাল থেকে হাত মুখ ধোয়নি।

'মা খুব খিদে পেয়েছে।' সে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে বলল। বচন কিন্তু ওঠবার নাম করল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আবার সে খাবার চাইল।

'আমি আজ রান্না করিনি।' বচন বলল—'কি করে জানব, প্রভু আজ আসবেন কিনা? গতকাল রাত্রের খাবার আমি সকালে খেয়েছি, সকালের রান্না সন্ধ্যেবেলায় খেলাম। আর কিছু নেই। তুমি বরং হোটেলে খেয়ে এস।'

'কাছাকাছি কোন হোটেল নেই।' বিন্নী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'কেন তুমি আমার ভাগের খাবার খেয়ে নিলে?' সে ছোট ছেলের মত ঠাট্টা করে বলল। তারপর তার পাশে বসে মার হাঁটুর উপর হাত রাখল। 'কই দাও, আমার খাবার দাও।'

'পেট কেটে বার কর, এই যে এখানে।' বচন খুব মিষ্টি তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেও হঠাৎ তার দুচোখ জলে ভরে গেল।

বিন্নী মায়ের চোখের জল লক্ষ্য করল না। .আমি নিশ্চিত জানি, বাক্সের মধ্যে খাবার আছে। এই বলে সে উঠে দাঁড়াল।' বচন তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল।

কাপড়ে জড়ানো চারখানা রুটি ও একবাটি মুসুর ডাল ছিল। বিন্নী খেতে আরম্ভ করল।

'এগুলো কিন্তু টাটকা রুটি।' মুখে শব্দ করে খেতে খেতে বিন্নী বলল।

'বাসি রুটি আমার ভাগ্যে জুটেছে।' বলে বচন এক গ্লাস জল তার পাশে রাখল। সে এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল। 'আর কোন খবর আছে?' বিন্নী প্রশ্ন করল।

লাল্লির কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো থেকে গ্লাসে জল ঢেলে দিল বচন।

'আচ্ছা।' বিন্নী যেন একটা কলের মানুষ, প্রাণ নেই, মন নেই। বচনের খুব কষ্ট হল। সে উঠোনে গিয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ল। চোখের জল গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হওয়াতে সে জোর করে তা চেপে রাখল।

কিছুক্ষণ পরে বিন্নী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'চিঠিটা কোথায়?'

'চিঠির কথা তোমায় ভাবতে হবে না।' সে বেশ কড়া মেজাজে বলে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

'আঃ বলনা কোথায়?....আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।'

'যাও শুতে যাও। পড়বার মত ওতে কিছু নেই।'

বিন্নী ঘরের ভেতর চলে গেল এবং পরে চিঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। বচন চাপা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'ভাই খুব একটা ভালো নেই।' সে বলল। হ্যারিকেনটা মাটিতে রেখে মায়ের খাটিয়ার কোণায় বসে পড়ল। বচন হঠাৎ উঠে বসল। বিন্নী বিড়বিড় করে প্রথম দু এক লাইন, তারপর পরিষ্কারভাবে চিঠিটা পড়তে লাগল। যেন ছন্দ ভাগ করে সে একটা কবিতা পড়ছে।

লাল্লি চিঠিতে লিখেছে তার রক্তের চাপ আবার অনেক বেড়ে গেছে এবং ডাক্তার তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিয়েছে। কুসুম ভালো আছে, তার গালে রক্তের আভা দেখা দিয়েছে। তারা আরও আলোবাতাস যুক্ত বাড়িতে উঠে গেছে এবং বাড়িটা তাদের স্কুল থেকে খুব কাছেই। দেওয়ালী এগিয়ে আসছে। তার বাচ্চারা ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। ঠাকুরমা প্রায় ছ মাস হল তাদের কাছ থেকে চলে গেছে। তার জন্য তাদের মন কেমন করে।

সবশেষে প্রথানুযায়ী অভিনন্দন। এই বলে বিন্নী পোস্টকার্ডটা নামিয়ে রাখল।

'তাকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করছে তার নাম কিছু বলেনি ?'

'তুমি যেন সব ডাক্তারকেই চেন ! না বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ?' বিন্নী আঘাত দেবার জন্য কিছু বলেনি কিন্তু বচন মনে প্রচণ্ড আঘাত পেল।

তার মুখটা ক্রমশ কঠিন হল। 'আমি কালই যাব।' সে বলল।

'আমি একা কি করে চালাব ? আমার খাবার....'

বচন তার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকালো, যেন বলতে চাইল লাল্লির জীবনের চেয়ে তোমার খাবারের বেশি দরকার ? 'তুমি কি আমার রান্নার উপর বেঁচে আছে ?' বচন কেটে কেটে বলল।

বিন্নী প্রত্যুত্তরে বলল, 'দাদার অসুখ নতুন কিছু নয়।'

'যাই হোক, আমি কাল চলে যাচ্ছি।' তারা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইল। তারপর বিন্নী কাঁধে ঝাঁকুনি মেরে আচমকা উঠে দাঁড়াল।

পরেরদিন সকালে যাবার সময় বলে গেল তাড়াতাড়ি ফিরবে। কিন্তু বিকেল হয়ে গেলেও ফিরল না। বচন যদিও কোন কাজে মন দিতে পারছিল না তবু সে রান্না এবং অন্যান্য টুকিটাকি কাজগুলো সেরে ফেলল। সে বিন্নীর সার্টে ছেঁড়া বোতামগুলো লাগাল, তার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে রাখল। তবু সে যে আজই চলে যেতে পারবে একথা সে মনে মনে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সম্ভবত বিন্নী রাত না হলে ফিরবে না। এমনও হতে পারে তার হাতে টাকা নেই। টাকা না থাকলে রেলের টিকিট কি করে কিনবে ? আজ মাসের উনিশ তারিখ এবং এই সময় বিন্নীর হাতে টাকা থাকার কথা নয়। তাকে যদি আরও পনের দিন টাকার জোগাড়ে থাকতে হয় তাহলে....

হঠাৎ বিন্নী ফিরে এল। সঙ্গে তার লম্বা চুলওয়ালা বন্ধু। শশী যার বিশেষ করে, কথা বলার সময় পায়রার মত ঘাড় ওঠানামা করে। সে সব সময় মায়েব রান্নার প্রশংসা করে।

আমি তোমার জন্য টিকিট কিনে এনেছি। বিন্নী বলল, 'কৈ তুমি তো এখনও তৈরীই হওনি ?'

'তুমি তো কখন যেতে হবে বলে যাওনি ?'

'বাঃ, কাল রাত্রেই যখন সব ঠিক হয়ে গেল তখন তোমাকে আর মনে করিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ? যাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। ট্রেন আর দু ঘণ্টার মধ্যে। আমাকে আবার কুড়ি টাকার ব্যবস্থা করতে হলো। মানে আমাকে ধার করতে হল ?' বচন নিজের বিছানা বাঁধতে আরম্ভ করল।

'মা সরে যাও। তুমি জাননা, কি করে বিছানা বাঁধতে হয়। দাও, আমাকে দড়িটা দাও। আমার এক সেকেণ্ডও লাগবে না।'

'তুমি খাওয়া শেষ কর। আমি বিছানা ঠিক করে নিচ্ছি।'

'শশী আমার সঙ্গে খাবে। সে তোমার রান্না ডাল খাওয়ার জন্যে পাগল।'

জলভরা চোখেও বচনের মুখে একটা হাসি বেরিয়ে এল। 'তা বেশ তো। আমি আরও কয়েকটা রুটি করে দিচ্ছি।'

'না, তোমাকে আর রুটি করতে হবে না। যা আছে তাতেই আমরা চালিয়ে নেব।'

'প্রথম আমি খাবো।' শশী বলল, 'বাকী যা পড়ে থাকবে বিন্নী তাতেই চালিয়ে নেবে।' সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল। 'আমি রাজী।' বিন্নী তার হাত দুটো ঘষতে ঘষতে শশীর কথার উত্তর দিল।

'আরে না, না, মা তোমার জন্যে অনেক রেখেছে।' ডাল দিয়ে রুটি চিবোতে চিবোতে শশী বলল। তাদের খাওয়া শেষ হলে বচন নিঃশব্দে বাসনপত্র সরিয়ে রাখল।

'মা, তোমার খাওয়া শেষ কর তাড়াতাড়ি।' বিন্নী মুখ ধুতে ধুতে বলল।

'আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'

'কখন?' মার কাঁধে বিন্নী হাত রাখল।

'তুমি আসবার আগে।'

'না, তুমি জোর করে ও কথা বলছ।'

'হ্যাঁ, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আশাকরি তোমার পেট ভরেছে।'

'আমার এখন চারভাগের এক ভাগ খিদে আছে।' শশী ঢেকুর তুলে বলল। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে সেটা পেরেকে গেঁথে সে হাসতে লাগল।

বচনকে রেলের কামরায় তুলে দিয়ে তারা প্ল্যাটফরমের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হাঁটতে লাগল। গতকাল রাত্রে বচন কিছু না খাওয়াতে খিদের জ্বালায় তার মাথা ঝিমঝিম করছে। বিন্নীরও মনে হল, মার খিদে পেয়েছে। সেইজন্য সে তার জন্য কিছু কলা কিনে দিল। সে একবার খাওয়ার ব্যাপারে অমত করেছে বলে কলা খেতে ভীষণ অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছে। বিন্নী যদি জোর করত তাহলে বোধ হয় খেতে পারত! তারা আলোচনায় এমন মগ্ন যে ততক্ষণে প্ল্যাটফরমের আর এক প্রান্তে চলে গেছে। কথা, কথা, শুধুই কথা। তারা কি নিয়ে এত আলোচনা করে? তারা কি অ্যাটলাসের মত পৃথিবীর সমস্ত ভার তাদের কাঁধে নিয়ে বইছে—এই দুজন যেন পৃথিবীর মানুষদের জন্যে নিজেরা কোনরকমে দুঃখকষ্টে

টিকে আছে এবং সেই জন্যেই নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নেয় না।

তারা আবার কামরার কাছে এসে পড়ল। বচন তাদের মুখগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করল। তারা গম্ভীর মুখে কথা বলে এবং নানারকম আকার ইঙ্গিত করে। কিন্তু বচনের কাছে তারা এখনও বাচ্চা। তারা বোধহয় ভুলে গেছে যে প্ল্যাটফরমে বিদায় জানাতে এসেছে। গার্ড হুইশিল দিল। তাদের কথাবার্তা কিন্তু চলতেই লাগল। ট্রেনটা ছেড়ে দিলে। বিন্নীর হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। মার হাত ধরে বলল, 'ভালো ভাবে থেকো মা।' মৃদু হাসি বচনের ঠোঁটে খেলে গেল। হাত বাড়িয়ে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একটু আদর করল। 'কবে তুমি ফিরবে?'

'যেদিন তুমি আমায় ডাকবে।'

ট্রেনটা বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে। জানলার বাইরে মাথা বাড়িয়ে বচন তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা হাতে হাত রেখে বেরুনোর দরজার দিকে চলেছে। তখনও তারা তর্ক করছে।

বচন এক পক্ষকাল আগে এসে পৌঁছেছে।

'বিন্নীর কাছ থেকে কোন চিঠি এসেছে কি?' বচন লাল্লির দরজার বাইরে এসে বলল। তার ছেলে, একসময় খুব ছোট ছিল আর এখন বড় হয়েছে। তার উপস্থিতিই এখন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার এই জিজ্ঞাসা যেন ক্ষমা চাওয়ার সুরে, কিছু আবেদন করার মত শোনায়।

'ভেতরে এসো মা।' লাল্লি কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, 'আজও কোন চিঠি আসেনি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে তার কি কোন কর্তব্যজ্ঞান নেই?'

'আমি তোমাকে বিরক্ত করছি না।' শুধু ঐ কথাটাই জানতে এসেছিলাম।'

বচন নিজের ঘরে ফিরে এল। সে জানে লাল্লির সময়ের দাম অনেক। অনেক রাত অবধি বসে পরের দিনের আদালতের কাগজপত্র দেখে। সে নতুন বাড়িতে আসার পর, সব সময় এত ব্যস্ত থাকে যে খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায় না। তার বাইরের ঘর থেকে সোজা শোবার ঘরে চলে যায় এবং বেশ কয়েকদিন বচনের সঙ্গে কথা বলারও সময় পায় না। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বচনেরও তাকে বিরক্ত করতে মন চায় না।

'রাত্রে কিছু ঠাণ্ডা তেল ওর মাথায় ঘষে দেবে।' লাল্লির বউ কুসুমকে সে 'বলল।'

'আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ওসব করার সময় নেই।' কুসুম একেবারে তৈরী উত্তর দিল।

'আমাকে ডেকো। আমি মাথায় তেল ঘষে দেবো।'

'সেটা কোন কারণ নয়। চাকররাও করতে পারে। কিন্তু আপনার ছেলে শোনে না।'

কুসুমের ব্যবহারে ইচ্ছাকৃত শিষ্টাচার এবং অতিরঞ্জিত বিনয়ের প্রকাশ দেখে বচনের মনে হত, সে একজন বাইরের লোক। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কেউ নয়। রান্না করার জন্য একজন রাঁধুনি আর বাড়ির কাজ করার জন্য একজন চাকর ছিল। কুসুম তাদের কাজ দেখাশোনা করত। তাদের সংসারে বচনের কোন স্থান ছিল না। বিনা কাজে সারাদিন কাটানো তার কাছে একঘেয়ে লাগত। সে যদি কোন কাজ করবার চেষ্টা করত কুসুম তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠত, 'মা দয়া করে আপনি ব্যস্ত হবেন না। চাকরবাকররা আছে কি করতে?' লাল্লিও একই সুরে বলত, 'মা আমাদের দুটো চাকর আছে।' সেও মনে করিয়ে দিত।

বচন ঘরে শুয়ে তার অনিশ্চিত অবস্থার কথা ভাবত। বিন্নী কেন এতদিন তাকে চিঠি লেখেনি? সে নিশ্চয় অপরিসর অন্ধকার ঘরে একা আছে। সে খাওয়ার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করেছে? চলে আসার আগে তাকে সব জিজ্ঞাসা করে আসা উচিত ছিল। তার কাছ থেকে চিঠি পেলে একটু আশ্বস্ত হতে পারত। কিন্তু বিন্নী লেখার কোন প্রয়োজন মনে করছে না।

সে জানালা দিয়ে আকাশটাকে ভালো করে দেখছিল। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধির সঙ্কেত তার জানা ছিল। এখানে তারাগুলোকে একটা কোণ থেকে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু বোম্বেতে ঠিক মাথার উপর দেখা যেতো। বোম্বেতে আকাশ দেখার সময় সে সবসময় বিন্নীর পায়ের শব্দের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। শূকরদের নাকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দও পাওয়া যেত এবং তারপর মিলিয়ে যেত। তারপর হঠাৎ কর্কশ অভদ্র শব্দ কানের মধ্যে ঢুকে তাকে বিভ্রান্ত করে দিত 'হুইডিডি ভেনজো ফাং গেল,....উ' কিরকম অপছন্দই না করত ঐ চিৎকার। কিন্তু ঐ বাংলোতে সব কিছুই নিঃশব্দ। বাচ্চারা বিছানায় শুয়ে পড়লে একটা অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু রান্নাঘর থেকে রঙ্গিলালের বাসনপত্র মাজার ও ঝাড়ু দেওয়ার শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসত।

সে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করত আর ঘুমোবার চেষ্টা করত। কিন্তু ঘুম আসত না। বোম্বেতে রাত দশটার পর জেগে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল কিন্তু এখানে বিছানায় জেগে শুয়ে থেকে ঘড়িতে এগারটা, বারটা, একটার ঘণ্টা বাজার শব্দ কানে আসে। তার এই পরিবর্তনে বচন নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

সে যখন সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন অন্য দিনের চেয়েও খুব

আলস্য বোধ করে। তার সামনে দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘতর রাত্রি যেন বিভীষিকা মনে হয়। একই নিয়মে আবার একটা দিন আসবে আর যাবে। রান্নাঘরে রঙ্গিলাল স্টোভ ধরিয়ে তার বাবুর জন্যে ভোরের চা তৈরী করতে শুরু করেছে। পূর্বদিকে সকালের সূর্য তার লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর আকাশে চড়াই পাখিরা মহানন্দে ছোটাছুটি করছে। সে কিছু গাঁদাফুল তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। রঙ্গিলাল তখন টি-পটে জল ঢালছে।

'শোন, আমি চায়ের পাত্র নিয়ে যাব।'

রঙ্গিলাল ইতস্তত করে বলল, 'মাইজি, আমি নিয়ে যাই। সাহেব আমার উপর রাগ করবেন।'

'কেন? রাগ করবার কী আছে এতে?'

কাঁধের উপর শাল জড়িয়ে বিছানায় বসে আদালতের কাগজপত্র দেখছিল লাল্লি। কুসুম তখনও ঘুমোচ্ছিল।

অভ্যাসের মত সে হাতে চায়ের কাপ ধরে তাকাতেই দেখতে পেল মাকে।

'মা, তুমি!' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

চায়ের কাপ দেবার সময় বচন এই প্রথম লক্ষ্য করল, লাল্লির রগের দুপাশে চুলে পাক ধরেছে এবং চোখের কোণে কালি পড়েছে।

লাল্লি চশমাটা চোখে দিয়ে ভালো করে দেখল। তারপর প্রশ্ন করল, 'নারায়ণ আর রঙ্গিলাল কোথায়?'

'নারায়ণ দুধ আনতে গেছে এবং রঙ্গিলাল রান্নাঘরে আছে।'

'সে চা আনতে পারল না কেন? আর সেইজন্য তুমি ভোরবেলা এই ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিলে, বাঃ। আমি নিজেই চা করে নিলে, ভালো হত।'

'তুমি দুধ আর চিনির মধ্যে কোনটা কি তা জানোই না, তুমি করবে চা?' বচন ফাঁকা হাসি হাসল।

কুসুমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'মা, আপনি?' সে বিছানা ছেড়ে নেমে এল।

'মা, আপনি এত কষ্ট করবেন না। আমি চা করে নিয়ে আসছি।' বলে কুসুম রান্নাঘর থেকে এক কাপ চা নিয়ে এসে এগিয়ে দিল।

'আমি এখনও স্নান করিনি। এখন চা খাবো না।'

'নাও মা নাও।' লাল্লি আবার বলল, 'তুচ্ছ ব্যাপারে হৈ চৈ করো না।'

না, বাবা না, বচন চায়ের কাপটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'স্নান করার আগে আমি কোনদিন চা খাই না।'

চায়ের কাপ নিয়ে কুসুম তার বিছানায় চলে গেল। বচন লাল্লির বিছানার একটা কোণে বসল। লাল্লি ও কুসুম নিঃশব্দে চা খেতে লাগল।

চা খাওয়া শেষ হলে কুসুম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর তাকাল দিকে। বচন উঠে দাঁড়াল।

লাল্লি কাগজ তুলে বলল, 'মা কি যাচ্ছ?'

'তুমি তোমার কাজ কর, আমি যাই, স্নান সেরে নি।'

'তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না, না, কিছু নয়। চাকর ট্রে নিয়ে আসছিল। আমি বললাম, দাও আমি তোমার বাবুর জন্য নিয়ে যাব।'

'লাল্লি মাথা নিচু করে কাগজ দেখতে লাগল।'

'আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি...'বচন বলল।

'বল।' কাগজ থেকে মুখ তুলে লাল্লি বলল।

''এতদিন হয়ে গেল তবু বিন্নীর কাছ থেকে কোন খবর নেই।'

'আমি অভিযোগ করছিনা', লাল্লি বিরক্ত হয়ে বলল, 'তার এই ভুলে যাওয়ার একটা সীমা আছে। তোমার ছেলে মনে করে আমরা তার আত্মীয় নই।' বচন চুপ করে রইল।

'সে যদি আমাদের সঙ্গে থাকত এতদিন নিশ্চয়ই বি. এ. পাস করত। এখন সে সারাজীবন ভবঘুরে হয়ে থাকবে।'

বচনের দুচোখ জলে ভর্তি হয়ে গেল। সে কান্না চাপবার চেষ্টা করেও পারল না। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল।

'আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই কখন সে নিজের ভালো বুঝতে পারবে। সময় সময় ভাবি তার সঙ্গে থাকাটাই বোধহয় ভালো।' বচন এই কথা বলে লাল্লির মুখের দিকে চেয়ে তার মতামতের জন্য অপেক্ষা করল। লাল্লির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে কোন কথা বলল না।

'যদি তার সঙ্গে থাকি তাহলে অন্তত তার উপর নজর রাখতে পারবো।' বচন আবার বলল।

'মার বোধহয় এখানে ভালো লাগছে না।' কুসুম বলল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অর্থপূর্ণ চোখাচোখি হল।

'এই কদিন হল তুমি এসেছ। আরও কিছুদিন থেকে যাও। দেওয়ালী আর মাত্র পনের দিন পরে।' লাল্লি বলল।

'কে এইসব বাচ্চাদের সঙ্গ ছেড়ে থাকতে চায়। ও আমি একটা কথার পিঠে

কথা বললাম। বচন এই কথা বলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বিন্নী যে কিভাবে খাচ্ছে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।'

কুসুম রঙ্গিকে চিৎকার করে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 'অবশ্য তুমি যদি একান্তই যেতে চাও সেটা অন্য ব্যাপার। লাল্লির চোখে মুখে একটা রাগের ছাপ ফুটে উঠল।

'এটা ঠিক নয় যে আমি যেতেই চাই। আমি শুধু ভাবছিলাম··'বলে বচন অন্য দিকে মুখ ফেরালো। তার চোখে আবার জল এসে গেল।

'যখন তুমি যাবার কথাই ভাবছ তখন এখানে থাকবার দরকার কি? শুধু শুধু এখানে থেকে মনকে কষ্ট দেওয়া।'

বচন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লাল্লি তার আঙ্গুলগুলো ঘষতে শুরু করল।

'কোন ট্রেনে আমি যেতে পারি তাহলে?'

'রাত্রের ট্রেনই তোমার পক্ষে ভালো হবে। ওটাতে ভীড় হয় না।'

'তোমার শরীরের অবস্থার জন্যই আমার দুশ্চিন্তা!' বচন ধীরে ধীরে বলল।

'আমার শরীর এমন কিছু খারাপ নয়····'

'তোমার শরীরের কথা নিশ্চয় তুমি আমাকে লিখে জানাবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় লিখব। যদি আমি সময় না পাই তবে নিশ্চয়ই কুসুম জানাবে।'

'বেশ ভালো।'

বচন মেয়েদের কামরায় একটা চমৎকার ভালো জায়গা পেল। কামরায় মাত্র দুজন যাত্রী ছিল। কুসুম বাড়ির চাকর নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছিল। লাল্লি তার মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেনি। কুসুম বচনের পাশে বসে গল্প করছিল। সে বলল যে, বাচ্চারা তাদের ঠাকুরমাকে দেওয়ালীর সময় পাবে না। তাঁকে ছাড়া বাড়ি ফাঁকা মনে হবে; সঙ্গে কিছু খাবার নিলে ভালো হত। এমনি অনেক কথা কুসুম অনর্গল ভাবে বলে। ট্রেনের হুইশিল বেজে উঠল।

'মা, তুমি বোম্বোতে পৌছেই চিঠি দিতে কিন্তু ভুলবে না।' কুসুম কামরা থেকে নেমে এসে বলল।

'তুমি লাল্লির স্বাস্থ্য সম্পর্কে লিখে জানাবে। হঠাৎ আবার বচনের লাল্লির রগের দুপাশে পাকা চুলের কথা মনে পড়ল। তাকে তুমি বেশি বেশি রাত অবধি কাজ করতে দিও না। ঠাণ্ডা তেল মাথায় মালিশ করে দিও।'

ট্রেন যখন স্টেশনের বাইরে এল তার মনটা একটা বিরাট শূন্যতায় ভরে গেল।

সে আকাশের দিকে তাকাল। একই নক্ষত্রপুঞ্জ দিগন্তে জ্বল জ্বল করছে। যেখানে সে পূর্বে বাস করত তা ক্রমশ অন্য রূপ নিতে আরম্ভ করল এবং তার চোখের উপর নাচতে সুরু করল। নিচু ছাদ, সরু জরাজীর্ণ ঘর। শূকরী এবং তার বাচ্চারা চলাফেরা করছে। কূয়োর দিক থেকে ভেসে আসা মোটা কর্কশ ভাঙ্গা গলার চিৎকার, 'ওনো ডিডি, ভেনজো ফাং গেল....'বলে অন্ধকারের নিঃসঙ্গ জীবন, বিন্নী, শশী এবং অন্যান্য বন্ধুরা। অফুরন্ত আলোচনা এবং খাবারের জন্য কাড়াকাড়ি....

তার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। দিগন্তের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রপুঞ্জ নিস্তেজ মনে হল।

সে চোখের জল মুছে ফেলল। হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মত নক্ষত্রপুঞ্জ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মুখের আদল

রামকুমার

আমরা তিনজন প্ল্যাটফরমের উপর অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে গল্প করছিলাম। শীতের প্রকোপ এড়াবার জন্য আমি কনুই দুটোকে হাঁটুর উপর রেখে বসে নদীর ধারের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে শ্যাওলাধরা দেয়ালের দিকে দেখছিলাম। সেখানে বহুদিনের পুরোনো ছাই রং-এর একটা জানালা চোখে পড়ল। নানা রকম অস্পষ্ট শব্দের মধ্যে হারমোনিয়াম নিয়ে একজন অন্ধলোক গান করছিল। গানের আওয়াজ এল কানে। তার গান অল্পক্ষণের জন্য যখন থামছে তখন, হারমোনিয়ামের সুরের আওয়াজ বাতাসের বুকে গিয়ে বিঁধছে।

অন্ধলোকটির দু ধাপ উপরে, সাদা শাড়ি পরে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতজোড় করে দূরে নদীব দিকে তাকিয়ে আছে সে। বয়স খুব বেশি নয়; কিন্তু তার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বোঝাই যায়না তার স্বামী জীবিত না মৃত। সবসময়ই ঘাটের উপর লোক আছে। কেউ একা নামছে আবার কেউ দল বেঁধে।

আমি আমার বোনের দিকে তাকালাম। ঘন অন্ধকারে তার মুখটা রহস্যে ভরা। মনে হল হয়ত বা মুখোশ পরা আছে। শাড়ির ভাঁজেব নীচে তার হাত দুটো জোড়া ছিল এবং চুলগুলি পেছনের দিকে শক্ত করে বাঁধা ছিল।

সূর্যের অন্তিম আলো নদীর জলে পড়ে তখনো চিক্ চিক্ করছিল। ছোট ছোট বুদবুদ জলের উপর উঠছে এবং ভেঙ্গে যাচ্ছে। কয়েকটা নৌকা ভুতুড়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা কি যাবো?'

আমার বোন আমার কথা শুনতে পেল না।

অন্ধলোকটা চণ্ডীদাসের একটা পদ গাইছিল। ছুটিতে এখানে এলেই আমরা প্রায়ই সন্ধ্যায় নদীর ধারটায় বেড়াতে আসি। যখন ফিরে যাই, গানের সুরটা তখনও আমার কানে বাজতে থাকে। আর আমার মনে যে কত রকমারি কল্পনা ভীড় করে আসে। আমি না থাকলে আমার বোন তো প্রায়ই আসে। কখনও একা আবার কখনও নিমুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু তখন বোন এই পাটাতনে এসে বসে না। কিংবা গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না।

সে সমস্ত হৃদয় ভরে নিয়ে আসে যে গানের সুর, মনে মনে সেই গানই গায়।

'চল যাই'। খুব নরম স্বরে বোন বলল।

আমি দাঁড়িয়ে নিমুর হাত ধরলাম। আমরা যখন বাজারের কাছে পৌঁছেছি তখন তার কব্জি ধরে ফেলেছি। এই ধরনের আদরে নিমু কিছু মনে করে না।

আমাদের বাড়ি গলির শেষ প্রান্তে। অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। বাড়ির দরজায় নম্বর পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ এমন কোন বিশেষত্ব নেই যে অন্যান্য বাড়ির ভীড় থেকে সহজেই তাকে খুঁজে বের করা যাবে। গলিতে কোন আলোর বন্দোবস্ত নেই কিন্তু তবু বুড়ো লোকেরা ঠিকমত পথ চিনে নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে যায়। আমরা সদর দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলে একটা দুর্গন্ধময় জমি পেরোতে হয়। চার তলায় আমরা থাকতাম। তা বেশ কয়েক বছর এখানে ছিলাম। তারপর চাকরি পেয়ে এখান থেকে চলে গেছি। এখন ছুটি পেলে এখানে এসে থাকি।

দিনের বেলায় বাড়িটা বেশ শান্ত পরিবেশে থাকে। একতলায় বৃদ্ধ বাড়িওলা এবং তার স্ত্রী থাকে। একতলায় আরও একটি বাঙালী পরিবার থাকে, বাড়ির লোকেরা সবসময় চুপি চুপি কথা বলে এবং রাত হলেই খাবার পাট চুকিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা এত অন্ধকার হয়ে যায়, মনে হয় যেন মাঝরাত্রি। কেউ যদি দেরি করে বাড়ি ফেরে তাহলে দেখতে পাবে বিবর্ণ ও নোনাধরা দেয়ালের ওপর তারার আলো পড়ে জায়গাটা কেমন ভয়াবহ দেখায়।

আমার বোন মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করত। নিমু ঘরের মধ্যে অলস হয়ে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে জানলার বাইরের দিকে তাকায়। নদীর আলোর দিকে যখন তাকিয়ে বসে থাকে তখন আমি তাকে লক্ষ্য করে হয়ত অন্য মেজাজে কিছু কথা শুরু করে কিংবা কোন ব্যাপারে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিই। কিন্তু সে এমন চুপ করে থাকে, তার মন এত নিবিষ্ট চিন্তায় মগ্ন যে আমি শত চেষ্টা করেও তার স্তব্ধতার ধ্যান ভাঙ্গতে পারি না।

গতকাল বোন আমাকে বলেছিল, 'নিমু কোয়ার্টারলি পরীক্ষায় ফেল করেছে। এইভাবে পড়লে সে ফাইনালে কিছুতেই পাশ করতে পারবে না।' সে তখন একটা কাপড়ের কার্পেটের উপর বসেছিল। 'পড়াশুনায় ওর মনই নেই।' একটু থেমে সে একই মেজাজে আবার বলল, 'আমি জানিনা শেষ অবধি কি হবে।'

আমি বোধহয় উত্তরটা জানতাম। তাকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা ছিল না। মৃদু কাঁপা আলো ঘরের মধ্যে আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে। সেটা বাইরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের চেয়ে ভয়াবহ। নিমু চলে গেলে আমি জানালার ধারে

দাঁড়ালাম। চারদিকের নিস্তব্ধতা, বালিয়াড়ি, ছোট ঝোপ এবং সীমাহীন আকাশে তারা সব একাকার হয়ে গেছে। এই ঘরে আমি থাকি। এক ঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকি। এই যে এখন আমি বাড়ি ফিরলাম, মনে হল আমি অনেক পথ হেঁটে এলাম।

আমার বোন থালায় খাবার এনে মাদুরের উপর রাখল। আমি এবং নিমু সামনাসামনি বসে খাওয়া শুরু করলাম। বোন আমাদের খাওয়া লক্ষ্য করতে লাগল। শাড়ির একটা দিক ওর মাথা থেকে খসে কাঁধের উপর পড়ে গেল। যখন সে তা বুঝতে পারল তখন আবার ঘোমটা টেনে দিল।

দুর্গাবাড়ি থেকে শাঁখের এবং ঘণ্টার আওয়াজ আমাদের ঘর থেকে অল্পই শোনা যায়। বোনের যখন বিয়ে হয়নি তখন আমরা দুটুকরো চিনির গোলার লোভে প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতির সময় যেতাম! আরতি শেষ হলে আমাদের দুটুকরো চিনির গোলা দেওয়া হত। সেই সময় আমাকে নিমুর চেয়ে বেশি বড় মনে হত না। নিমু এখন আমার সামনে মাথা নিচু করে বসে খেয়ে চলেছে। আমার উপস্থিতি তাকে হতবুদ্ধি কিংবা ভীত করে না। কিছু অগোছালো চুল তার চোখের উপর পড়েছে। যদিও বোন তাকে কিছু বলেনি, আমার মন বলছে সে নিমুর কাছে কিছু শুনতে চাইছে এবং সঠিক সুযোগের অপেক্ষা করছে।

বাইরের অন্ধকার এখন ঘন রাত্রে পরিণত হয়েছে। আবছা এবং অপরিচিত কোন বাঙালী মহিলার মুখ মনে পড়েছে—যেন জলের ঘাটে সে একা দাঁড়িয়ে। তার স্বামী আছে না মৃত! ঘটনা যাই হোক, তার করুণ মুখ একাকীত্বেরই প্রকাশ।

প্রাতরাশ খাবার পর আমি সাধারণত একটু বেড়াতে যাই। নিমুর স্কুল ছাড়ার পর এই একাকীত্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সূর্যের আলো যখন থাকে তখন আমি জানালায় বসতে ভালবাসি। কিন্তু কিছুক্ষণ বসার পর ক্লান্তি আসে। সেই জন্য আবার ঘাটে একটু ঘুরে বেড়াই। তারপর নদী পেরিয়ে অপর পারে যাই। বালির পাড় সূর্যের আলোয় চক্‌চক্‌ করে। দূরের সবকিছু তখন মনে হয় ঝোপঝাড় এবং তার পিছনে পাহাড়ের সারি দেখতে পাই। পায়ের তলায় আলগা বালি মাড়িয়ে আমি বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াই। খাঁকি প্যাণ্টের পকেটের মধ্যে আমি হাত রেখে দিই। হাতগুলো আমার পাশে ঝুলবে এটা আমি পছন্দ করিনা।

আমি অন্য শহরে কাজ করতে যাব, মা সেটা পছন্দ করে না। আমরা বহুকাল ধরে এখানে আছি। মা এই বাড়ি ছাড়বে না অথচ আমার কাছে বরাবর থাকতে চায়। তার ভয় হয় যে মৃত্যুকালে তার বিছনার কাছে হয়ত আমাকে পাবে না।

আমার বোন একবার এই কথাই বলেছিল। কিন্তু আমার করার মত কিছুই নেই। নদীর পাড়ের কাছে নৌকোতে বসে ছেলেরা মাছ ধরতে ব্যস্ত ছিল। তাদের থেকে কিছু দূরে একটা বালিয়াড়িতে গিয়ে বসতাম। আবহাওয়ায় শান্তি বিরাজ করছিল। ছুটির বাকী দিনগুলি কি এইভাবেই উপভোগ করতে হবে ?

সেদিন সন্ধ্যায় যখন রিক্সা করে স্টেশন থেকে আসছিলাম, রাস্তার উপর এগিয়ে চলা ছায়া দেখে নিজেকে খুব একা এবং নিঃস্ব মনে হচ্ছিল। রাস্তার অল্প আলোয় সব কিছুকে মনে হচ্ছিল একটা পাতলা কুয়াশা ঢাকা বলে। খুব সম্ভবত নিমু আমার কাছে কিছু উপহার আশা করেছিল। যখন সে অধীর আগ্রহে বারবার এদিক-ওদিক দেখে আমার টিনের বাক্সর উপর চোখ রাখছিল তখন মনে হচ্ছিল আমি তাকে প্রতারিত করছি। বোনের বারবার বলা সত্ত্বেও সে বিছানায় শুতে যাচ্ছিল না। শেষে যখন আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম তার খোলা বড় বড় চোখ আমার সামনে যেন অন্ধকারেও নাচছিল।

কিছুদূরে কতকগুলি নৌকো আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেবেলার নানা রঙের সুখস্মৃতি, যদিও বহুদিন পেরিয়ে এসেছি তবুও ম্লান হয়ে যায়নি। তখন আমি নৌকোর মধ্যে বসে থাকতাম এবং সমুদ্রে পাড়ি দিতাম। সেই সব বাসনা এখনও পূরণ করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু আমার সন্দেহ হয় তা কোনদিন সম্ভব হবে কিনা।

এখন সূর্য আমার মাথার উপর। আর কিছুক্ষণ বাদে বিকেল হবে। জামাকাপড় থেকে বালি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হয় বহু মাইল অতিক্রম করে এসে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নিমু বোধহয় এখন স্কুলে গিয়েছে তবু বাড়ি ফেরার ইচ্ছে করছে না।

অরূপ যখন এখানে ছিল তখন দুজনে একত্রে অনেক সময় কাটাতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বালির উপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর আশা করতাম অলৌকিক কিছু একটা ঘটুক যাতে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অথচ আকাশ যেমন থাকার তেমনি থাকত এবং ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যেত।

অরূপ একদিন শহর ছেড়ে চলে গেল। তার কথা কিন্তু বহুদিন মনে পড়ত। রাত্রে তার ট্রেন ছেড়ে চলে যাবার শব্দ কেবলই শুনতে পাই। তাকে যেদিন বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম সেদিনের কথা মনে পড়ে। রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একটা ভীড়ের কামরায় তাকে বসে থাকতে দেখলাম। আমি কি যেন বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয়নি।

নিমুকে দেখে আমার ভগ্নীপতির কথা মনে পড়ে। যখন একা থাকি তখন তার মুখ মনে করতে পারিনা। আমি মাত্র কয়েকবার তাকে দেখেছিলাম। নিমু যখন জন্মায়, মার সঙ্গে তাদের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য থাকতে হয়েছিল। সে খুব অল্প কথা বলত, সবসময়ই তাকে শান্ত এবং নির্লিপ্ত দেখাত। আমি জানিনা আমার বোন কোনদিন তার মনের মধ্যে ঢুকতে পেরেছিল কিনা।

তার মৃত্যুর পর বোন যখন চিরদিনের মত নিমুকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে থাকতে এল, ভগ্নীপতিকে দেখে যেমন অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, নিমুর উপস্থিতিতে আমার সেইরকম মনের অবস্থা হয়েছিল। আমার সেইরকম মনের অবস্থা হলেও নিমু কিন্তু তার বয়সের অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় অন্যরকম ছিল। শান্ত, চিন্তাশীল এবং ভগ্নীপতির মত নির্লিপ্ত।

'তার কি হবে?' বোনের উদ্বিগ্ন প্রশ্নে আমি হেসে ফেললাম।

আমি যখন বাড়ি থাকতাম, নিমুর সঙ্গে অনেক দূরে বেড়াতে যেতাম। ভীড়ের মধ্যে যখন তার হাত ধরতাম, তখন মনে হত আমরা খুব কাছাকাছি এসেছি। তার নরম হাতদুটো ধরতে আমার খুব ভালো লাগত। কিন্তু যখন তার মুখের দিকে তাকাতাম হঠাৎ অনুভব করতাম, তার হাতদুটো বরফের মত ঠাণ্ডা।

ছুটির সময় বাড়ি আসার চিন্তা করলেই আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরত। ট্রেনে আসার সময়, যখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতাম, পুরোনো স্মৃতি সব ভীড় করে আসতো। গন্তব্যস্থল যত এগিয়ে আসত, ততই সব স্মৃতি মুছে গিয়ে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা মা, বোন এবং নিমুর কথা একসঙ্গে মনে পড়ত। মনে পড়ত, রাস্তার ধারের বাড়িটা, উপরের তলায় দুটো ঘর এবং সেই আশ্চর্য জানালা যেখান থেকে অনেক দূরের বালিয়াড়িও কাঁটাগাছের ঝোপ দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় প্রতিবেশী বাঙালী পরিবারটির সঙ্গে দেখা হয়, মনে হয় আমি মানুষ না দেখে ভুত দেখছি। কোন শুভেচ্ছার বাণী কিংবা হাসির ধ্বনি তাদের মুখে আমি শুনিনি। একসময় তাদের নাকি কোলকাতায় বড় ব্যবসা ছিল, এইরকম কথাই শুনেছিলাম। বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। এখন তারা সবরকমে রিক্ত। কয়েক বছর আগে, এই পরিবারের একটি জোয়ান ছেলে মারা গেল। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ একটু শোক প্রকাশ করেনি কিংবা বুক চাপড়িয়ে কাঁদেনি। শুধু ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা দেখে লোকে সন্দেহ করেছিল বোধহয় কাউকে তারা হারিয়েছে। কেউ জানতেও পারেনি কখন মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাড়িওলা এবং তার স্ত্রী বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। চোখে কম দেখে এবং কানেও শুনতে পায় না। মাসিক ভাড়া আদায় করা ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে কোন

যোগাযোগ রাখে না।' কেন রাখত না, জানি না।

'একটু বড় হলে নিমুকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও'। —আমার বোন বলল, 'এখানে ওর লেখাপড়া হচ্ছে না, কাউকে ও গ্রাহ্যই করে না। একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' বৃথাই আমাকে এসব কথা বলা, কারণ আমার কিছুই স্মরণে নেই।

আমরা এখানে প্রায় তিরিশ বছর ধরে বাস করছি। আমার বাবা এই বাড়িতে মারা গেছেন। যদি মাকে এখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তবে তাঁর সুখদুঃখের স্মৃতি জড়ানো সব ঘটনাবলীর অপমৃত্যু ঘটবে।

সেদিন স্কুলের ছুটি ছিল। আমি যখন বেড়াতে বের হচ্ছি, নিমু আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল। 'তুমি কি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?' ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে কোন উত্তর দিল না। শুধু আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে মনে হয় সে আমাকে খুব পছন্দ করে। আমাদের বয়সের পার্থক্য যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে তা সে ভুলে যায়। আমাকে অনুকরণ করে সেও তার প্যান্টের পকেটে হাতদুটো রেখে দেয়।

আমরা গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে বাজারে যাই। কাছেই দুর্গাদেবীর মন্দির। নদীর পাড়ে নৌকো বাঁধা থাকে এবং তার ওপারে সীমাহীন বালির চর।

'ওপারে কি যেতে চাও?'

নিমু লাফিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল। মাঝির মুখ আমাদের পরিচিত। আমরা তাকে বহু বছর ধরে চিনি। সে জিজ্ঞাসা করে, 'শহরে গেলে কি কোন চাকরি পাওয়া যাবে?' এখানে তাকে খুব কষ্ট করে বাঁচতে হয়। বেশ কিছু সংখ্যক মাঝি তাদের পূর্বপুরুষের জীবিকা বর্জন করেছে। নিজেদের নৌকো বিক্রি করে শহরে চাকরির সন্ধানে চলে গেছে। আমি তার কথা শুনে কোন মন্তব্য করি না। তার কথা বোধহয় নিমুরও কানে যায় না। সে জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

যদি অরূপ সঙ্গে থাকত, তবে আমাদের মধ্যে কথার ফুলঝুরি চলতে থাকত। প্রথমে সে আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখত। তারপর আস্তে আস্তে কমে গেল এবং পরে আর লিখত না। আমি জানিনা সে এখন কোথায় আছে। আমরা তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বড় হয়ে দুজনে একই অফিসে চাকরি নেবার চেষ্টা করব এবং একসঙ্গে ঘর ভাড়া করে থাকব। এখন সে সব মনে হলে হাসি পায়। শুধু পুরোনো প্রতিজ্ঞাই নয়, আরও অনেক স্বপ্ন যা রূপায়িত হল না।

'নিমু, তুমি কি আমার সঙ্গে শহরে যাবে?'

যেন তার ধ্যান হঠাৎ ভঙ্গ হল। কিন্তু সে আমার দিকে তাকাল না।

'আমি সেখানকার স্কুলে তোমাকে ভর্তি করে দেব। ওটা বেশ বড় শহর।

চারদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা পুরোনো কেল্লা আছে। সেই কেল্লার মধ্যে একটা খোলা জায়গা আছে, গুপ্তপথ, কামান এবং কামানের লোহার বল সেখান থেকে ছোঁড়া হত....'

মাঝি আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। যখন আমি থামলাম তখন সে আবার তার নিজের কথা শুরু করল....এমন একদিন ছিল যখন তার ঠাকুর্দার দশটা নৌকো ছিল। ব্যবসা খুব চালু ছিল। এখন রেল সব জায়গায় গেছে এবং বাস দূর দূর গ্রামে পর্যন্ত চলাচল করছে। কিন্তু আগেরদিনে নৌকোই ছিল যানবাহনের একমাত্র অবলম্বন। বিয়ের লগ্নের সময় একটা নৌকো জোগাড় করা খুব মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। কারণ তখন চাহিদা খুব বেশি হত। তার ছেলেবেলার কথা এখনও মনে পড়ে। বরযাত্রী দলের সঙ্গে নৌকা নিয়ে সে বিয়েবাড়িতে যেত। সারারাত্রি সানাই বাজত। নাচগান, খাওয়াদাওয়া সবই ছিল। এত উপহার পেত যে বয়ে আনতে রীতিমত কষ্ট হত।

সেই পুরোনো কাসুন্দী। আমি বহুবার এসব গল্প তার কাছে শুনেছি। কিন্তু নিমু খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে। চোখ বড় বড় করে সব কথার নির্যাস যেন দুচোখ দিয়ে সে চুষে নিতে চায়। চুলগুলো তখন ওর ভ্রূর কাছে ঝুলে পড়ে। অনুভব করি, যদি অনেকদূর চলে যাই, তবু এই স্মৃতি আমাকে তাড়া করে যাবে।

এক ঝাঁক পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তাদের পাখার ঝটপটানির শব্দ শুনতে পেলাম না। আকাশে কি রাস্তা আছে? পাখিরা কি তাদের পথ ভুল করে না? যখন ছোট ছিলাম তখন এই ধরণের বহু প্রশ্নই করতাম। কিন্তু কোন উত্তর পেতাম না। এখন আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি।

আমি কখনও নিমুর মন বুঝতে পারিনি। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিংবা হাত ধরে চলার সময়ও তার মন জানতে পারিনি। আগে আমি আর নিমু একই বিছানায় ঘুমোতাম। তখন সে ঘুমের মধ্যে আমার গলা তার হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরত। আমি চলে গেলে আমার সঙ্গে এক বিছানায় তার আর শোওয়া হবে না।

বোন বলত যে নিমুটা কেমন একগুঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে সবসময় ঝগড়া করে। প্রায়ই মাস্টারমশাইরা তার নামে অভিযোগ করেন। সে বুঝতে পারেনা বাড়িতে নিমুকে এত নির্লিপ্ত দেখায় কেন! সবসময়ই মুখ বন্ধ করে আছে। আর যদি তাকে কখনও ভর্ৎসনা করা হয় সে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। একবার সে দুদিন কিছু খায়নি। নিমু যেন বোনের কাছে গা-ছমছম করা ভয়।

ভগ্নীপতির মুখ আর নিমুর মুখের আদলে মিল আছে। বোন কি স্বামীর মুখ

নিমুর মুখে স্পষ্ট দেখতে পায় ? তার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে....যদিও তাদের নাক, ঠোঁট এবং চোখ সবই আলাদা। কৌতুহলের বিষয় ভগ্নীপতিকে সবসময় ঘিরে রাখত এমন কতকগুলো অস্পষ্ট ভাবনা-ভঙ্গি যাকে স্পর্শ করা যায় না। আর সে সবই যেন নিমুর মধ্যে বর্তমান। কিম্বা এমনও হতে পারে আমার মনকে আমি নিজেই বুঝতে পারিনা।

আমার ছুটি শেষ হয়ে আসছে। আমি আবার গতানুগতিক কাজের মধ্যে গিয়ে পড়ব। ঘরে একাই বাস করতে হবে আমাকে। কখনও প্রতিবেশীদের চিৎকার, তারপর অফিস আর অফিস।

'আমি দেওয়ালীর আগে আর আসতে পারব না।' মার ঘোলাটে চোখে জল আসে। কিন্তু বোনের হয়ত তত কষ্ট হবে না। নিমু তার সঙ্গে থাকবে। আমি বুঝি মার জগৎটা রিক্ত হয়ে গেল। সমস্ত শরীরটা তার কোঁচকানো, খালি হাতদুটো হাঁটুর ওপর রেখে মা তার উপর চিবুকটা রাখল। এখন সব শান্ত। এমন শান্ত পরিবেশটা বিদীর্ণ করে হঠাৎ কোথা থেকে একটা শেয়ালের ডাক ভেসে এল। বাঙালী পরিবারে সমস্ত লোকজন বোধহয় গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে আছে কিংবা তারাও বিছানায় শুয়ে জেগে আছে। নিমু ঘুমিয়ে পড়েছে। বালিশ থেকে তার মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে।

এই সমস্ত কথা আমি ট্রেনে যেতে যেতে ভাবি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার চিন্তাধারা উথাল-পাতাল করে। কাল, হ্যাঁ কাল থেকে আমি আমার পুরোনো কাজের মধ্যে ডুবে যাব। কেবলমাত্র কোন সন্ধ্যার সময় চণ্ডীদাসের গান আমার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হবে, কিংবা সেই বাঙালী মেয়েটির কথা মনে পড়বে যে নদীর সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিল একা! তার স্বামী কি জীবিত না মৃত?

জোঁক

অমরকান্ত

একদিন খুব ভোরে যখন বাজারে তরিতরকারি কিনতে যাচ্ছিলাম তখনই আমি তাকে প্রথম দেখি। নিমগাছের তলায়, শিবনাথবাবুর বাড়ির ঠিক সামনে যেখানে ভাঙা বাড়ির আবর্জনা জমা হয়ে পড়েছিল তারই মাঝে কালো এবং রোগাটে লোকটি ময়লা লুঙ্গি গায়ে দিয়ে শুয়েছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন রাত্রে আকাশ থেকে জ্ঞান হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে। কিংবা একজন দক্ষিণ ভারতীয় পথচারী সাধু বহুপথ ঘুরে এখানে বসে 'প্রাণায়াম' করার ভঙ্গিতে সাঁ সাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে।

আমি তাকে কয়েকবার দেখেছি, কখনো ক্লান্ত হয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, কখনও বা কারও বাড়ির দরজার সামনে চুপ করে বসে আছে, কিংবা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। লোকটার বিষয়ে কিছুই জানতাম না বা জানবার আগ্রহও ছিল না। কিন্তু একটা নিষ্ঠুর ঘটনাসূত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল।

এই ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক এক হপ্তা পরে। রাত এগারটার সময় খাওয়ার পর খোলা জায়গায় শুতে এসেছিলাম। মার্চ মাসের রাত্রি, চারদিক অন্ধকার, দমকা বাতাস বইছিল। মাঝে মাঝে রাস্তার ধুলো সারা গায়ে উড়ে এসে লাগছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যেন গায়ে পাউডার লাগিয়ে দিচ্ছে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ 'মার ব্যাটাকে, মার ব্যাটাকে', চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আমি চোখ খুলে চারদিক তাকালাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু মনে হল এত হৈ চৈয়ে আমাকে ঘুমোতে দেবে না। গণ্ডগোলটা শিবনাথবাবুর বাড়ির দিক থেকেই আসছিল এবং ক্রমে ক্রমে আরও বাড়ছিল। কোন রকমে উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে পায়ে চটিটা গলিয়ে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখলাম আমার ধারণাই ঠিক। শিবনাথবাবুর বাড়ির সামনেই বেশ ভীড়। গোলমাল শুনে অনেকেই ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে

তাঁর বাড়ির সামনে হাজির হয়েছে। ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ভাঙ্গা স্তূপের বাসিন্দা, সেই ভিখারীটিকে দেখলাম। শিবনাথবাবুর ছেলে রঘুবীর, পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে তার হাত দুটো ধরে আছে। দুতিনজন লোক খেপে গিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারছে। শিবনাথবাবু এবং বেশ কয়েকজন লোক আগুনঝরা চোখে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন।

ঐ ভিখারীটি দেখতে বেঁটে খাটো, মুখের হাড় বেরিয়ে এসেছে। কোটরগত চোখ, বুকের পাঁজরাগুলো ফাটা বাঁশের মত দেখা যাচ্ছে এবং ফোলা পেটটা ঠিক যেন একটা মাটির জালা। দারুণভাবে মার খেতে খেতে সে চিৎকার করে চলেছে, 'দয়া কর, আমাকে দয়া কর-আমি বৈরাগী।'

শিবনাথবাবু আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বলতে লাগলেন, 'এ একটা কুখ্যাত চোর, একটা অসৎ লোক।' তিনি আমাকে ঘটনাটা জানাবার জন্যে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'দুঃখের বিষয়, চেহারা দেখে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। দোষ আমাদেরই, দীন অবস্থা দেখে আমাদের হৃদয় সহজেই গলে যায়। বাড়তি খাবার, শাকসবজি শুকনো ছোলা হাতের কাছে যা পাই—তা এদের দিতে দ্বিধা করিনা। তবু এরা আমাদের এভাবে ঠকায়। এই হতভাগাটাকে নিশ্চয় আগে দেখেছেন। দেখে মনে হত, কয়েকমাস এক টুকরো খাবারও পেটে পড়েনি। কে ভেবেছিল যে ব্যাটা এত বদমাইশ, একটা কুকুর!'

এবার তিনি ভিখারীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'এই হারামজাদা, কোথায় শাড়ি লুকিয়ে রেখেছিস? তাড়াতাড়ি বের করে দে, নইলে এমন মারবো যে তোর পূর্বপুরুষরাও উঠে বসবে।'

চিৎকারে শিবনাথবাবুর গলা ভেঙ্গে যাওয়াতে স্বর বুজে গেল। মার কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল কিন্তু তাঁর কথায় উত্তেজিত হয়ে কুস্তিগীরের নিষ্কর্মা ছেলে রামজী মিশির এসে পায়ের জুতো খুলে ভিখারীটিকে মারলে আরম্ভ করল।

খুশী হয়ে শিবনাথবাবু আবার শুরু করলেন, 'আমি গত এক হপ্তা ধরে একে এই মহল্লায় দেখে আসছি। লোভী কুকুরের মত সব জায়গায় নাক শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছিল। আমার বউ দয়াপরবশ হয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়েছিল, এবং সেই থেকেই তার যাওয়া আসা শুরু হল। রোজ আসত সে। এটা খুব বড় কথা নয়। আপনাদের শুভেচ্ছায়, দু'চারজন ভিখারী প্রতিদিনই সবসময় বাড়ির চারধারে ঘুরে বেড়ায়। আমরা তাদের খাওয়াই, তার জন্য কাতর নই। এই হারামজাদাও দুএকবার গাইবার নাম করে এখানে গাইতে এসেছিল। খুব খুশী মনে দুবেলা পেটভরে খেতে দিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত, আজ সে একটা

নতুন শাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে।' তিনি মুখ বিকৃত করে জলজলে চোখ দিয়ে ভিখারীটাকে দেখলেন। ভীড়ের দিকে তাঁর জলন্ত দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে চাইলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হত তিনি ভিখারীটিকে জীবন্ত গিলে ফেলতেন।

'আপনি কি নিশ্চিত যে ঐ লোকটাই শাড়িটা চুরি করেছে?' আমি তাঁকে শান্ত করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি আপনার কথায় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।' তিনি রেগে বললেন, 'এইটিই তো বড় সূত্র। যদি চোরের কাছে মাল সমেত পাওয়া যায় তবে সে চোর, চোরই নয়! চোর ধরার এইটেই মস্তবড় সূত্র, জানবেন। আমি ওদের চালাকি জানি। মার না খেলে এরা চুরির জিনিস ফেরত দেয় না। তবে শুনুন; সকালবেলা প্রায় দশটা নাগাদ শাড়িটা হারিয়েছে। যমুনা বলেছে, ঠিক ঐ সময় ওকে সন্দেহজনকভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে সে দেখেছে। আপনিই বলুন, আমাদের বাড়ির দরজা হাট করে খুলে রাখা সত্ত্বেও গত দশ বছরে কোন চুরি হয়নি? আর লোকটা এই পাড়ায় আসার পরই কেন এই চুরিটা হল? ভুল বুঝবেন না, এদের হাড়ে হাড়ে আমি খুব ভালো করে চিনি।'

প্রত্যেকটি মারের সময় ভিখারীটা সশব্দে কেঁদে বলছিল, 'সে একজন বৈরাগী।' এটা ঠিক, বৈরাগী সম্প্রদায়ের লোকেরা আর যাই করুক চুরি করে না। সেও চুরি স্বীকার করছিল না দেখে দর্শকদের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। 'এটা হচ্ছে একটা বর্ণচোরা ঘুঘু!' এই বলে রামবলী তাকে একটা প্রচণ্ড চড় মারল। মেরে আবার সে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। কেউ কেউ বলল, 'ভিখারীটিকে পুলিশে দেওয়া হোক।' এসব দেখে আমি যখন ফিরে আসছি তখন শিবনাথবাবুর ছোট ছেলে যোগিন্দর ছুটে এসে বাপের কানের কাছে চুপি চুপি কি যেন বলল।

শিবনাথবাবুকে হতবুদ্ধি অবস্থায় দেখলাম। আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে, যখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আত্মগতভাবে বললেন, 'এই বারের মত ওকে ছেড়ে দাও। যথেষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয় সাবধান হবে।'

আমি শিবনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি নির্লজ্জের মত বললেন, 'শাড়িটা বাড়িতেই ছিল। যাক্ এতে মনে করবার কিছু নেই। শেয়ালের মত ছোটলোকদের মাঝে মাঝে উত্তম মধ্যম দিলে ভালো হয়। একে সহজেই ছেড়ে দেওয়া হল। চোরেরা এর চেয়ে অনেক বেশি মার খায়। তবুও তারা স্বীকার করে না। এটা একটা শিক্ষা হল।'

ভিখারীটা বাঁ চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে রাস্তায় পড়ে রইল। শিবনাথ-

বাবু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, 'ছেড়ে দাও এবার! ব্যাটা ছোটলোক, লেবু না নিংড়ালে কি রস বার করা যায়?'

আমার কাছে এটা একটা বিরাট বিস্ময়, ভিখারীটা কি করে অত মার খেয়েও পাড়ায় বহাল তবিয়তে রয়ে গেল। ঘটনাটা আমি প্রায়ই ভাবতাম কিন্তু সেই রহস্যের আজও সন্ধান হয়নি। এমনও হতে পারে সে ভেবেছিল তার সততা কষ্টিপাথরে বিচার হয়ে গেছে। অতএব তার পক্ষে পাড়ার লোকদের বিশ্বাস এবং সহানুভূতি লাভ করা সহজ হবে। হয়ত বা সে ভেবেছিল নতুন কোন জায়গায় গেলে যদি আগের মতই ব্যবহার পায়।

যে কোন কারণেই হোক, ভিখারীটি আমাদের পাড়ার একজন অংশীদার হয়ে গেল। আর তার সম্পর্কে আমার জানবার ইচ্ছেও বেড়ে গেল। আমি তাকে প্রায় ভাঙ্গা বাড়ির স্তূপের কাছে দেখতে পেতাম। হয় সে খাবার খাচ্ছে আর নয়ত ঘুমিয়ে আছে অথবা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। ফেলে দেওয়া খাবার, যেটা পাড়ার কুকুর বেড়ালে খেতো, এখন সেটা তার ভাগ্যেই জোটে। কেউ কেউ আবার তাকে অতিরঞ্জিত করে ধার্মিকও বলত। সেই ধরণের লোকদের সংখ্যা অবশ্য ক্রমশ কমে যেতে লাগল। শূয়োরের মত সে সব জায়গায় খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতো। সাধু বা ধার্মিকরা যতই পবিত্র দেখতে হোক না কেন, খাবার ব্যাপারে তাঁরা অন্যরকম পন্থা অবলম্বন করেন।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পেয়ে ভাঙ্গা বাড়ির আস্তানাটা ছেড়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দালানে কিংবা বারান্দার কোণে সে আশ্রয় নিল। তাদের কিছু কিছু কাজও সে করে দিত। কিন্তু শিবনাথবাবুর যতই দান ধ্যান থাক, ও বাড়ির ধারে কাছে আর সে কোনদিন যায়নি।

একদিন ভিখারীটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় শিবনাথবাবু তাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর তার দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন, 'দেখ, তোমার অপরাধ মাপ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমার শূয়োরের মত জীবনযাপন করাটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমি তোমাকে খেতে দেবো এবং থাকবার জায়গাও দেবো।'

দরদটা যে শুধু মুখের নয় কাজেও সেটা বোঝাবার জন্য শিবনাথবাবু ভিতর থেকে একটা ঝাঁটা আনিয়ে ভিখারীটাকে বাইরের ছোট একটা ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে থাকতে বললেন।

ভয়ে কিংবা ভালবাসায়, বলা খুবই কঠিন, ভিখারীটা একটা বাস করার মত ঘর পেলো। লোকটার নতুন নাম দেওয়া হল—রাজুয়া, অন্তত সেই নামেই সে

পাড়ায় পরিচিত হল।

কিন্তু শিবনাথবাবুর বাড়ি থাকা রাজুয়ার ভাগ্যে ছিল না। সামান্য কিছু সাহায্যের বিনিময়ে, রাজুয়া যে শুধু শিবনাথবাবুর কাজ করবে পাড়ার লোকদের সেটা সহ্য হল না। তাদের মতে পাড়ার লোকদের কাজ করার জন্যই ভগবান রাজুয়াকে পাঠিয়েছে। সুতরাং ওর কাছ থেকে কাজ পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। যখন সে শিবনাথবাবুর কোন কাজ করতে যেত তখন তারা তাকে ধরে নিজেদের কাজ করাতো। আর কাজ করতে অস্বীকার করলে খারাপ ব্যবহার করতো। 'তুমি শিবনাথবাবুর কেনা গোলাম নাকি?' কেউ আবার বলত, 'তোমার এমন কি ক্ষতি সে করতে পারে? তুমি আমার কাছে থাকো। সে তোমাকে কি দেয়? একমুঠো শুকনো ভাত, এইতো?'

রাজুয়ার তখনও শিবনাথ-ভীতি কাটেনি। তা থেকে মুক্ত হতে সে পারেনি। যাই হোক, অপরের কাজগুলি চটপট সে করে দিত। একদিন যমুনালালের ছেলে জুঙ্গী রাজুয়াকে বলল তার জন্যে কয়েক পয়সার জ্বালানি কাঠ কিনে আনতে। রাজুয়া তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেও কথা রাখতে পারল না। যখন সে যমুনালালের বাড়িতে গেল তখন জুঙ্গী প্রথমেই তাকে যা দিল তা হচ্ছে দুটি বিরাশি শিক্কার চড়। 'হারামজাদা, তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ! তুমি দেখ, কেমন করে তোমাকে সারাদিন কাজ করিয়ে নি। আমিও সকলের সঙ্গে এই পাড়াতেই থাকি।' এই ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কিন্তু কেউ তার উপর সম্পূর্ণ দখল নিতে পারতো না। পাড়ার কোন পড়শী তাকে সারাদিনের কাজ দিতে রাজী ছিল না। কূয়ো থেকে কয়েক বালতি জল আনবে কিংবা বাজার থেকে তার মালপত্র আনবে এমন ক্ষমতাও তার ছিল না। সে নানারকম টুকিটাকি কাজ করত এবং তার বিনিময়ে সে যে খাবার পেতো তাই খেয়ে থাকতো। এখন বলা যায় সে কোন ব্যক্তিবিশেষের নয় বরং পাড়ার সকলের।

সে আমার বাড়িতেও আসতে আরম্ভ করেছিল। তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্ত্রীর পক্ষে না বোঝার কিছু ছিল না। বাড়িতে তাকে দুএকবার দেখেছিলাম কিন্তু কোন আগ্রহ প্রকাশ করিনি।

কোন এক ছুটির দিনে বাড়িতে বসে একটা বই মনযোগ দিয়ে পড়ছি হঠাৎ কানের কাছে কে যেন শূয়োরের মত চিবোচ্ছে আর নাক ডাকছে বলে মনে হল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম রাজুয়া খেতে খুব ব্যস্ত। আমার দিকে তাকিয়ে সে যে একটা বড় কাজ করছে হাসিতে তা বুঝিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ হলে প্রশ্ন করলাম, 'রাজুয়া, তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

সে না বুঝতে পারার ভান করে উঠে দাঁড়াল। প্রথমে সে মুখ বিকৃত করল। পরে ময়লা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'আজ্ঞে, আমার বাড়ি রামপুর।'

'কেন তুমি গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছ?' আবার তাকে প্রশ্ন করলাম।

মুহূর্তের জন্য আমার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। যেন আমাকে কি উত্তর দেবে তার জানা নেই। 'এখানে আসার আগে আমি রারসায় ছিলাম।' এমন নীচু স্বরে সে কথাটা বললে, মনে হল, রামপুর থেকে সোজা এখানে আসা ভারি অপরাধ। কিন্তু তার হতভাগ্য জীবনে 'যদি' এবং 'কেন'-র কোন মানেই হয় না। তার কাছে এটাই যথেষ্ট যে সে রামপুরে নেই; বর্তমানে এখানে আছে এবং এ-ব্যাপারে তার কোন কৈফিয়ৎ নেই।

তার দিকে ভালো করে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন রামপুরে আছে?'

'না বাবু, আমার বাবা ও দুই বোন ছিল। তারা প্লেগে মারা গেছে।' বলে সে দেঁতো হাসি হাসল।

আমি আর তাকে কোন প্রশ্ন করলাম না। আমার আগ্রহও ছিল না। সেও তাড়াতাড়ি তার কাজে চলে গেল। মিষ্টির দোকানে ঝুলে পড়া বাতিটার মত তার মাথাটা নড়ে। তার হাত পা লাঠির মত সরু। তার পেটটা জালার মত ফুলে বিশ্রী দেখায়। তার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ! মহাত্মা গান্ধী কি জয়!' কয়েক মাস কেটে গেল। আমি ঘরের মধ্যে বসে রাজুয়া শ্লোগান দিচ্ছে শুনতে পেলাম এবং তার পরেই সে হেসে উঠেছে। সে আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'দয়াময়ী মাগো, একটু নুন দাও। রামবলী মিশির আমাকে কয়েকটা রুটি দিয়েছে। আমি ডাল তৈরী করব।'

স্ত্রী রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। রাজুয়া কিছু ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করল। স্ত্রী নুন দিয়ে প্রশ্ন করল, 'রাজুয়া সত্যি করে বল, তুই কবে শেষ চান করেছিস?'

সে হেসে চলে যেতে যেতে বলল, 'সব উৎসবের দিনে চান করি।'

আমি সব শুনলাম। রাজুয়া বোধহয় আমার উপস্থিতি টের পায়নি। তবে এটা ঘটনা যে রাজুয়া এখন পাড়াতে শিকড় গেড়ে বসেছে। তার খাওয়ার ভাবনা নেই। উপরন্তু লোকেরা তাকে আস্কারা দিত এবং মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে মজা করত বলে সে কিছুটা নির্লজ্জ হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ধ্বনি দিয়ে নিজের উপস্থিতি জাহির করত লোকের সাহায্য পাওয়ার জন্য। নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে সবাইকে হাসাতো।

কিছুদিন পর, যে রকম অনুমান করেছিলাম রাজুয়ার ঠিক সেই রকম পরিবর্তন হচ্ছিল।

অফিস থেকে ফেরার পথে জলের কল তলায় তার গলা পেলাম। পাতিয়ার বউ বাসন মাজছিল। সে হেসে বলল, 'নমস্কার বৌদি, কেমন আছেন ?'

পাতিয়ার বউ রেগে চিৎকার করে বলল, 'তোমার সাহস খুব বেড়েছে তো ? বেরিয়ে যাও হারামজাদা ! নইলে তোমার মাথায় এই বাসন ভাঙ্গব।' তারপর সে গালাগাল দিতে লাগল।

রাজুয়া ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। গাধা যেমন ঘাস দেখে আনন্দে মাথা নাড়ে সে তেমনি করতে লাগল।

মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল। নিচুঘরের মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করতে গেলে তারা নানারকম গালমন্দ করত এবং সেও মাথা নেড়ে সেটা গাধার মত উপভোগ করত।

আমার মত পাড়ার লোকেরাও তার স্বভাব বদলে যাওয়ায় দারুণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে তার নামের আগে তারা 'শালা' ব্যবহার করত। বড়দের মত ছোটরাও তাকে 'রাজুয়া শালা' বলত এবং তার সম্পর্কে শালা শুনে সে খুশী হয়ে মাথা নাড়ত।

কোন কোন সময় তাকে খেপাবার জন্য বলত, 'এই রাজুয়া শালা, বিয়ে করবি ?' তেতো জিনিস খাচ্ছে এমন মুখ করে সে হিক্কা তোলার মত হাসত তারপর সরে পড়ত। রাস্তায় চলতে, কারুর বাড়ি ঢুকতে কিংবা কলতলায় যেতে সে রাজনৈতিক শ্লোগান দিত, কবীরের দোঁহা কিংবা মজার ছড়া কাটত। রাস্তায় চলার সময় সে চোখ নিচু করে যখন আপন মনে হাসত, তখন সে ঠিক জানত লোকে তাকে লক্ষ্য করছে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। সরযু নদী পারাপার হওয়া কিংবা গঙ্গার ধারে বেড়ানোর চেয়ে রেললাইন ধরে হাঁটা কম আনন্দের হলেও খুব ভালো লাগত। নদীর ধারে বেড়ানোর অসুবিধে এই যে বর্ষার সময় জল বেড়ে গিয়ে দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং শীতকালে জলাভূমিতে হাঁটার বিপদ থাকে। অনেক সময় আমার বেশিদূর বেড়াতে ভালো লাগে না। তখন রেল ষ্টেশনে ঘুরতে বেশ লাগে। ঐরকম এক সন্ধ্যায় ষ্টেশন ঘুরে যখন পুলিশ ফাঁড়ির দিকে যাচ্ছি, সামনেই দেখি রাজুয়া আগে আগে হাঁটছে। আমি যেদিকে যাবো ঠিক করেছি, দেখি সে সেদিকেই যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, সে মাঠের দিকে যাচ্ছে কিন্তু তাকে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়াতে দেখে

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দুজন পুলিশ একটা বেঞ্চে বসে আড্ডা মারছে এবং বিশেষ ধরণের নোংরামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কাছেই দেখলাম একটা কুৎসিত দর্শন নোংরা এবং উলঙ্গ মেয়ে বসে আছে। কয়েকদিন যাবৎ পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং বখাটে ছোঁড়ারা পেছনে লাগলে গালিগালাজ করে।

রাজুয়াকে দেখি এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। সে পুলিশদের দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে এগিয়ে গেল এবং মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে লাগল।

'এই মেয়ে, তুমি কি ভাত খাবে?' হাসিমুখে এই কথাকটা বলে সে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা বাজখাঁই আওয়াজ কানে এল, 'এই শালা, তুই কে রে? বেরিয়ে যা, নয়ত টুকরো টুকরো করে ফেলবো।'

রাজুয়া একটু পিছিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, 'বাবুরা, আমি রাজুয়া।'

অন্য পুলিশটি বলল, 'দেখ, ভাগাড়ের দিকে শকুনির ঠিক নজর পড়েছে। শিগ্‌গির চলে যা, কুত্তা কোথাকার।'

আমি ততক্ষণে ওখান থেকে চলে এসেছি। আর কিছু শুনতে পাইনি এবং পরে কি হল তাও জানিনা।

ঘটনাটা ওখানেই শেষ হয়নি। যখন শুতে যাচ্ছি, আমার স্ত্রী বেশ উত্তেজিত-ভাবে ঘরে ঢুকল। তারপর সে হাসতে হাসতে বলল, 'এই বেরিয়ে এস, মজার জিনিস দেখবে এস, তাড়াতাড়ি।'

এসে যা দেখলাম তাতেই আমি হতবাক হয়ে গেলাম। ঘটনাটা দেখে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাজুয়াকে দেখি পাগলি মেয়েটার আগে আগে চলেছে। যখন পাগলি দাঁড়িয়ে পড়ছে রাজুয়া তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সবসময় তার দিকে লক্ষ্য রাখছে এবং মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথা বলছে। আমারই সামনে যে পরিত্যক্ত বাড়ির ছাদে আজে-বাজে লোকেরা শোয় সেখানে তাকে নিয়ে সে তুলল।

কিছুক্ষণ পরে রাজুয়া তাড়াতাড়ি নেমে এসে ষ্টেশনের দিকে গেল। কয়েক মিনিট পর একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে ফিরে এল।

তারপর কয়েকদিন তার আর দেখা পাইনি। ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে ভীষণ উৎসুক ছিলাম। তার সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার অজ্ঞানতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'তুমি জাননা? কেউ তাকে খুব মেরেছে। সে বরণদের বাড়িতে শুয়ে আছে।'

'কেন, কি হয়েছিল?'

'সেই পাগলি মেয়েছেলেটাই তার সর্বনাশ ডেকে আনলে।' সে হেসে আরও

বলল, 'তাকে পরের দিন ছাদে রেখে নরসিংবাবুর বাড়িতে কাজও করতে গেল। সারাদিন কাজে তার মন ছিল না, মনে আনন্দ বলতেও তার কিছু ছিল না। কোন কিছু হারিয়ে গেছে এই মনোভাব নিয়ে সে যখন তখন ছলচাতুরি করে ঐ পড়ো বাড়ির ছাদে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। নরসিংবাবুর স্ত্রী খাবার দিলে সে না খেয়ে যত্ন করে কাগজে মুড়ে রেখে দিল। যখন কাজ থেকে ছাড়া পেল তখন প্রায় রাত এগারটা। ছাদে এসে সে দেখল মেয়েটার পাশে অন্য একটা লোক শুয়ে আছে। রাজুয়া প্রচণ্ড রাগে যেই চেঁচিয়ে উঠেছে—আর যায় কোথায়—ঐ গুণ্ডা লোকটা তাকে প্রচণ্ড মার মেরে মেয়েটাকে নিয়ে একেবারে উধাও।'

আরও কিছুদিন কাটলো। গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল; অসহ্য গরমে গা-জ্বালা-করা লু বইতে লাগল। রাজুয়া সুস্থ হয়ে উঠে আবার পাড়ায় কাজে লেগে গেল। এখন তার একটা পরিবর্তন বেশ অনুভব করা যায়। সে আর কোন মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করে না কিংবা মাথা দুলিয়ে অসভ্যতা করে না।

স্ত্রী আরও খবর দিল যে রাজুয়া বড় দাড়ি রেখেছে। রাজুয়ার কথা মনে পড়াতে সে হেসে উঠে বলল, 'সে এখন সাধু হয়েছে। বরণের বউকে শাস্তি দিতে চায়। সেইজন্যই সে দাড়ি রেখেছে এবং শনিচারী পূজা করে।

আমি যখন তার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিলাম না তখন সে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল। বেশ কয়েক মাস আগে যখন সে মার খেয়ে বরণের বাড়িতে ছিল তখন বরণের স্ত্রীর সঙ্গে সে কাকী সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। সে যা রোজগার করত, নিরাপদ জায়গা ভেবে সে বরণের স্ত্রীর কাছেই রেখে দিত। আস্তে আস্তে সে দশ টাকার মত জমিয়ে ফেলল। একদিন টাকাটা দাবী করল সে কিন্তু বরণের স্ত্রী পরিষ্কার কথাটা অস্বীকার করল। ঘটনাটি রাজুয়াকে খুব আঘাত করল এবং তারপর থেকেই সে দাড়ি রাখতে আরম্ভ করল। সে প্রতিজ্ঞা করল যতদিন না বরণের স্ত্রীর কুষ্ঠ হয় ততদিন সে দাড়ি কামাবে না। এই ব্যাপারের পরই সে শনিচারী দেবীর শরণাপন্ন হল। স্থানীয় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ যে শনিচারী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত, প্রবল রাগী এবং পিশাচী। তাঁর কোপে পড়লে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়।

আমাকে আরও জানাল, তার নাকি এখন মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে। বরণের স্ত্রী বোধ হয় কিছু করেছে; লোকে বলছে নিশ্চয়ই তাকে তুকতাক করেছে। কিন্তু রাজুয়ার নিজের দেবীর ক্ষমতার উপর ছিল একান্ত বিশ্বাস। তার নিশ্চিত ধারণা, এক সপ্তাহের মধ্যে বরণের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে মারা যাবে।

আমি জানি না তার জ্বর ছেড়েছিল কি না? জানার ইচ্ছেও ছিল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম শনিচারী দেবীর উপর অগাধ বিশ্বাস ওর মনে একটা ধর্মীয় ঝোঁক এনে দিয়েছিল। তার দাড়ি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকের কাছে তার পরিচিতি হয়ে গেল ভক্ত রাজুয়া। তার বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যায় চাতুর্য ও কৌশলের ছাপ থাকত। পণ্ডিতের দোকানের সামনে জনসভা করে রাম-সীতা সম্পর্কে আলোচনা করত। ভূত ও ডাইনি সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করত। শ্রোতাদের পূজার নিয়ম পদ্ধতি তুক করা সম্পর্কেও জ্ঞান দিতো।

কিন্তু অনেকরকম ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, আলোচনা, শনিচারী দেবীর পূজা এবং দাড়ি রাখা সব বৃথাই গেল। তার মনস্কামনা পূর্ণ হল না। ভাগ্যের পরিহাস, সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরছি, স্ত্রী বলল, 'রাজুয়ার কলেরা হয়েছে।'

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কি! জীবিত না মৃত!' স্ত্রী উত্তেজিত হয়েই উত্তর দিল, 'সে ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যে শুয়ে আছে। বমি মাখামাখি করে পড়ে আছে। সকলে বলছে, তার অবস্থা শেষ হয়ে এসেছে।'

'তার কি ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে?'

'তাকে ওষুধ দেবার মত কে সেখানে আছে? সে তখন শিবনাথবাবুর বাড়িতে কাজ করছিল। রোগের লক্ষণ দেখতে পেয়ে তাকে বাড়ি থেকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে সে রামজী মিশিরের দাওয়ায় ওঠে। যখন ওরা জানতে পারে যে রাজুয়ার কলেরা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর সে ভাঙ্গা বাড়ির নিমগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।'

আমি স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বললাম, 'তুমি তাকে বাড়িতে আনতে পারতে।' আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কোন্ সাহসে একথা বলছ? আমাদের কি বাচ্চা নেই? একবার ঐ ছোঁয়াচে রোগে ধরলে আর নিস্তার আছে?'

আমি উঠে পড়লাম। দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, 'যাই দেখে আসি।'

'সাবধান।' স্ত্রী বলল, 'ওকে বাপু ছুঁয়ো না, আর তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

গিয়ে দেখি দু-চারজন তার দিকে তাকিয়ে ওর শেষ অবস্থাটা দেখছে।

আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম, 'রাজুয়া!'

রোগে আচ্ছন্ন থাকায় সে আমার কথা শুনতে পেল না। সমস্ত গায়ে নোংরা লেগে আছে। শরীরের পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে এবং চোখের কোলে কালি

পড়েছে। মুখ হাঁ করে শুয়ে শুয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে।

কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, এমন সময় শিবনাথবাবু উপস্থিত হলেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'বোধ হয় বাঁচবে না।'

তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম। তাঁর প্রতি যেমন বিরক্ত হয়েছিলাম তেমনি নিজেও অসহায় বোধ করছিলাম। আমার চোখের সামনে রাজুয়া মারা যাচ্ছে দেখে শরীর কাঁপছিল। আমি কি তার উপকারে লাগতে পারি? আমি মাত্র একশো টাকার মাইনের গরীব কেরানী। উপরন্তু মাসের শেষ। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। এক দৌড়ে হাসপাতালে গিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিয়ে এলাম। রাজুয়া তখনও বেঁচেছিল। দুজন জমাদার যখন তাকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলল তখন মনে হল, আমার বিবেকের বোঝা অনেকটা নেমে গেল। একটা গভীর আত্মতৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল।

রাজুয়া সে যাত্রায় বেঁচে গেল। সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও আগের মত শক্তি সামর্থ পেল না। ভালো করে হাঁটতে পারে না, মনে হল সে যেন খড়ের পুতুল।

জানিনা কি কারণে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা সে আমার বাড়িতে এল এবং আমিও তাকে কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে আশ্রয় দিলাম। আমরা তাকে বিশেষ যত্ন করতে পারছিলাম না, ফলে একদিন আবার তাকে ভাঙ্গা বাড়ির আবর্জনার মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখলাম।

শিবনাথবাবু দরজার বাইরে তেল মাখছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'রাজুয়া আবার ভাঙ্গা বাড়িতে চলে গেছে।' সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'তার কথা বলবেন না।' তিনি খুব রেগে বললেন, 'কে তাকে সবসময় সাহায্য করতে পারে? বদমাইশটার এখন আবার চুলকানি হয়েছে। যেখানেই যাক সে সবসময় গা চুলকোচ্ছে। তার ঠিক হয়েছে। কয়েকদিন আগে তাকে আমি কুয়ো থেকে জল আনতে বলেছিলাম। সে কথার অবাধ্য হয়নি। সে কুয়ো থেকে জল আনবার সময় পড়ে গেল। নিঃসন্দেহে জল পড়ে গিয়ে নষ্ট তো হলই তার উপর পিতলের ঘড়াটারও কানায় দাগ পড়ে গেল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলাম। গরীবদের দয়া করি বটে কিন্তু নিজের ক্ষতির কথাও তো ভাবতে হবে।'

'ঐ রকম লোককে গুলি করে মারা উচিত।' স্বর্ণকারের ছেলে চন্দ্রদীপ টিপ্পনি কাটল, 'কেন এত দেরি করে মরতে দেওয়া হবে? কেন তাদের দুঃখকষ্টের দিন কমিয়ে আনা হবে না? গান্ধীজী বিষ খাইয়ে গাধাকে কি মেরে ফেলেননি?'

'তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে বলেছ'—শিবনাথবাবু গরম হয়ে বললেন,

'কোথায় আমাদের সরকার এই লোকগুলোর দেখাশোনার ভার নেবে, তা না সরকার শুধু বড়লোকদের খাতির করে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরে যাচ্ছে, সরকার যেন নীরব দর্শক! ....আমরা কী করতে পারি, বল, আমরা তো আর সরকার নই।'

আমি বোকার মত তাদের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম।

বেশির ভাগ সময় রাজুয়া ভাঙ্গা বাড়িতে থাকত। ওর গা বোঝাই চুলকানি। ওর রক্তটাই দূষিত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে খাবারের সন্ধানে সেও বেরিয়ে পড়ত। মুখটা ভীষণ ফুলে উঠেছিল, রংটা হলদে আর হাত-পা সব পোড়া কাটির মত দেখতে হয়েছিল। চেহারাটা কঙ্কালসার বললেই চলে।

জুন মাস পড়ে গেল। প্রথম বর্ষার ঝড় বৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টির জল বাইরের নর্দমা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ও পূর্বের ঠাণ্ডা বাতাস শরীরটাকে কাঁপিয়ে তুলছিল। সেদিন রবিবারের সকাল। অফিসের কিছু কাজ করব বলে বসেছিলাম কিন্তু মনযোগ দিতে না পারায় উঠে পড়লাম। বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। দেখি, একটা চোদ্দ বছরের রোগা পটকা ছেলে জানলায় উঁকি দিচ্ছে।

'কি চাও?' আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম।

সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'রাজুয়া মারা গেছে।'

'মারা গেছে? কখন? কোথায়?'—আমি বললাম।

'ঘটনাটা সত্যি বাবু।' এই বলে সে একটা পোস্টকার্ড বের করে বলল, 'রামপুরের ভজনরাম বৈরাগীকে লিখে দিন বাবু—গোপাল মারা গেছে।'

'গোপাল?'

'হ্যাঁ বাবু, ঐ নামেই রাজুয়াকে তার গ্রামের সবাই ডাকে।'

রাজুয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে কিন্তু খুব কষ্ট হয়নি। এতদিন যে যন্ত্রণা ভোগ করছিল তা থেকে সে এখন মুক্তি পেল। আমায়ও সে স্বস্তি দিল। শেষ সময়ে তাকে কী বীভৎস দেখতে হয়েছিল। তবু আমার কষ্ট হত যখন ভাবতাম একটা লোক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ার জন্য সারাজীবন যুদ্ধ করে গেল কিন্তু জীবন তাকে কোন সুযোগই দিল না। যদিও আমাদের এই জায়গাটা তার নিত্যসঙ্গী মানুষগুলোর মায়া কাটিয়ে কেন সে অন্য কোন জায়গায় চলে যেতে পারল না, অন্য কোন কাজের সন্ধানও করল না। এই ছন্নছাড়া জীবনটাকেই সে বেশি ভালবাসত? সে কি জোঁকের মত এই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কিংবা জীবনই জোঁক হয়ে তার শেষ রক্তবিন্দুও চুষে নিল?

রাত তখন প্রায় আটটা। বারান্দায় বসেছিলাম। আকাশ মেঘে ঢাকা। আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন কিসের ষড়যন্ত্র করছে। টুলের উপর রাখা হারিকেন হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল এবং আলোর চারদিকে পাক খেতে খেতে একটা মথ আমার জামার মধ্যে ঢুকল। আমি ঘরে যাবো কিনা ভাবছি হঠাৎ আমার সামনে একটা ছায়া দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। রাজুয়ার মত দেখতে একটা কঙ্কালসার লোক যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বড় বড় চোখ করে ভয়ে তাকিয়ে রইলাম। কঙ্কালটা এগিয়ে এল। রাজুয়াকে দেখলাম—যেন কতকগুলো হাড়ের সমষ্টি আমার সামনে দাঁড়াল।

সে কাছে এসে বলল, 'বাবু আমি বেঁচে আছি। আমি মারা যাইনি।' তার শুকনো ঠোঁট দিয়ে একটা করুণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল। অপার বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু ঐ ছেলেটা এসে যে তোমার মরার খবর দিল?'

রাজুয়া নোংরা দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'ঐ ছেলেটা বাণ্ডুরামের ছেলে। বাজারে থাকে। ঘটনাটা বাবু আর কিছু নয়, একটা কাক একদিন আমার মাথায় বসেছিল। এটাকে ওরা সবাই অশুভ লক্ষণ বলে ধরে। এটা নাকি তাড়াতাড়ি মানুষের মরণ ডেকে আনে।'

'তাহলে ঐ চিঠিটা কেন বাড়িতে পাঠাতে বলেছিলে?' আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করি।

'ও ঐ চিঠির ব্যাপার?....আপন লোকের কাছে যদি মরার খবর দেওয়া হয় তাহলে নাকি অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। জানেন বাবু, ভজনরাম বৈরাগী আমার খুড়ো। ঠিক আছে বাবু, আর একটা পোস্টকার্ড নিন। দয়া করে এবার লিখে দিন যে গোপাল এখনও বেঁচে আছে।'

চিঠিটা লেখার পর তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। তার মুখটা ঘিরে মৃত্যুর ছায়া ঘন হয়ে রয়েছে আর রাজুয়া তবুও প্রাণপণে জীবনকে ধরে আছে। সে নিজেই কী একটা জোঁক, না দুর্বহ জীবনটাই তার শরীরের উপর অতিকায় জোঁকের মত চেপে বসে আছে! সে কি তার জীবনের রক্ত চুষে খাচ্ছে না জীবনটাই তার রক্ত চুষছে? আমি কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

অচল সিকি

'দয়া করে, ভাড়াটা দিন।'

ট্যাক্সিটা প্রায় গন্তব্যস্থানে এসে পড়েছিল। গাড়ির ক্লীনার মোহন পেছনের সীটের তিনজন যাত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বলল, 'ভাড়াটা দিন।'

এক এক করে তিনটে সিকি তার হাতের উপর পড়ল। গাড়ি গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। দরজাটা ধরে ধাক্কা সামলে সিকিগুলো পরীক্ষা করল মোহন। একটা সিকি অচল।

তার জেব্রা মার্কা সার্টের পকেটে ভালোগুলো রেখে অচল সিকিটা তালুতে নিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'এটা কে দিয়েছেন? দয়া করে বদলে দিন।'

মোহনের প্রসারিত হাতের দিকে তাকিয়েও কোন যাত্রীই সাড়া দিল না। যাত্রীরা পরস্পরের দিকে এক চমক তাকাল। কোন কিছু হয়নি এরকম ভাব দেখিয়ে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে কথা বলতে লাগল।

আবার অনুরোধ এল। উত্তর মিলল না। এই ট্যাক্সিটা, আসলে একটা স্টেশন ওয়াগান ভেঙ্গে তৈরী করা। প্রত্যেকদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় প্যাটেল নগর থেকে সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত যাতায়াত করে। সাধারণত সাতজন যাত্রী যেতে পাবে এতে কিন্তু এগারজন পর্যন্ত তোলা হয়। সকলেই সরকারী কর্মচারী। ভাড়া কম বলে বাসে না গিয়ে ট্যাক্সিতেই যাতায়াত করে।

মোহন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যাত্রীদের দিকে নজর করছিল—দুজন মধ্যবয়সী লোক এবং তাদের মধ্যে একজন মোটাসোটা গোলগাল চেহারার লোক, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অচল সিকিটা নিশ্চয় তাঁর কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু তাঁকে এমন গোবেচারা দেখাচ্ছিল। জীবনে তিনি যে কোনদিন অচল কিছু দেখেছেন তা ওঁর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল না। আশ্চর্য ব্যাপার, অচল সিকিটার মালিকানার দায় কেউ নিতে রাজী হচ্ছিল না।

ব্যাপারটা একটা ঝামেলায় পরিণত হচ্ছিল। তাছাড়া যাত্রীরা সকলেই নতুন। প্রতিদিনের চেনা-শোনা যাত্রীরা এরকম ছলের আশ্রয় নেয় না। সবাই জানে একদিন এভাবে ঠকালেও দ্বিতীয় দিন আর বোকা বানানো যাবে না।

ট্যাক্সি জোরে বাঁক নিয়ে প্যাটেলনগর স্টপেজে দাঁড়াল। মোহন গাড়ির দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অচল সিকিটা কি আকাশ থেকে পড়েছে?'

তিনজন লোক মোহনের দিকে তাকালো।

মোটা লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'ওটা আমার নয়।'

যে কালো রোগা লোকটা দরজার কাছে বসেছিল, সে প্রতিবাদ করে রেগে বলল, 'চুপ কর' চুপ কর। অচল সিকি আমার নয়।' মোহন জিজ্ঞাসু চোখে ড্রাইভার ত্রিলোক সিং-এর দিকে তাকাল। 'ছোড় দে ইয়ার।' ত্রিলোক সিং উদাসভাবে বলল—'কই আদমি চার আনা পয়সাকা লিয়ে ঝুট বোলবে না।'

মোহনের চোখের সামনে দিয়ে সবাই ট্যাক্সি থেকে একে একে নামল।

সবশেষে যে নামল তাকে দেখতে রোগা এবং ফর্সা। চোখে তার রোল্ড গোল্ডের চশমা আর হাতে ব্যাগ, পরনে সাদা সার্ট এবং সাদা প্যান্ট। মুখে তার মিটিমিটি চাপা হাসি।

ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এসে সে একটু থামল। তারপর মোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই, আমার কথা বিশ্বাস করতে পার, আমার সিকিটা অচল ছিল না।'

ক্লীনার তার জবাবে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ড্রাইভার দ্বিতীয় গীয়ারে গাড়ি ছাড়ার আওয়াজ করল। মোহন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। গাড়িও সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের দিকে দৌড়তে লাগল। এই সময়টায় সবাই ব্যস্ত, সময় নেই কারুর সাক্ষ্য-সাবুদ নিয়ে ঝগড়া করার।

২

মদনগোপাল চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে রাখল। তারপর ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে বলল, 'আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে।'

তার স্ত্রী রাধা ঘটনাটা শুনতে আগ্রহী হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?'

'আজ আমার সাইকেল ছিল না, সেতো তুমি জানো। সেইজন্য বাড়ি ফেরার সময় ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম। আমি পেছনের সীটে বসে, আর দুজন আমার দুধারে বসেছিল। প্রত্যেকেই ভাড়া হিসেবে একটা করে সিকি দিয়েছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাটা ঠিক ধরে ফেলেছিল একটা সিকি অচল। সে বলল, এটা কার? দয়া করে বদলে দিন। কিন্তু কেউ স্বীকার করল না।'

'তাই নাকি!....তারপর?' রাধার মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এল। সে বলল, 'নিশ্চয় তোমার নয়।'

'না, সেটা আমার নয়। আর যদি আমারই হতো তবুও করার কিছু ছিল না। কারণ মাত্র চার আনা পয়সাই আমার পকেটে ছিল।'

কিন্তু সকালে আমার কাছ থেকে একটা টাকা নিলে—মনে নেই ?'

'এঁ্যা, এক টাকা নিয়েছিলাম ! ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে—চার আনা পয়সা খরচ করে অফিস গিয়েছিলুম। এক বন্ধু অফিসে দেখা করতে এসেছিল, তাকে চা খাওয়াতে আট আনা খরচ হয়ে গেল।'

'এটা কিন্তু খুব খারাপ।' রাধা গম্ভীরভাবে বলল। তার মনে হচ্ছিল, অচল পয়সাটা তার স্বামীরই।

'আরে ছাড়ো দিকি—ওরকম ব্যাপার রোজ ঘটছে!' বাতাসে হাত দুটো দুলিয়ে নিয়ে মদনগোপাল বললেন, 'এবার পুজোয় কোথায় যাবে—ভেবেছ কিছু ?'

রাধাকে তবু কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। অচল পয়সা দিয়ে ঠকানো একটা পাপ ; এবং পাপ ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরের ভেতরে ঢোকে, এইসব চিন্তা করে সে কেঁপে উঠল। তক্ষুনি উঠে সে একটা লোহার ট্রাঙ্ক খুলে তার থেকে পয়সার থলিটা বের করল। তারপর থলির মুখ খুলে কিছু পয়সা বের করল। 'এই নাও, চার আনা পয়সা ; এক্ষুনি গিয়ে তাদের দিয়ে এস। আমি নোংরামি পছন্দ করি না।'

মদনগোপাল না হেসে থাকতে পারলেন না। স্ত্রীর এই সহজ সরল স্বভাবটির জন্য তাকে কত মিষ্টি দেখায়। বিনা কারণে সে অযথা ভাবতে বসে। আর তার চিন্তান্বিত মুখে ভাবনার রেখা পড়লে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। মদনগোপাল হাসতে হাসতে চেয়ারে গড়িয়ে পড়লেন। হাসি থামিয়ে অবশেষে বললেন, 'তুমি কি করে মনে করলে যে অচল সিকিটাই আমার ?'

'এটা অসম্ভব নয়! তাই নয় কি ? ভালো চাওতো এক্ষুণি গিয়ে এই সিকিটা দিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বিরক্ত হয়ে মদনগোপাল আবার বললেন, 'দয়া করে একটু থামো, একই ব্যাপারে আলোচনা আর ভালো লাগছে না।'

'তুমি এখনই ফেরৎ দিয়ে আসবে না কেন ?'

'এই সময় আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে কোথায় পাবো ? সকাল আটটায় ট্যাক্সি-ওয়ালা স্ট্যাণ্ডে আসে। আমি ওকে কাল দিয়ে দেবো।'

৩

রোল্ডগোল্ডের চশমা ঠিক করে নবীন বলল, 'সত্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস, তোমার বিবেক যাকে সত্য বলে মেনে নেয়।'

'না।' রাকেশ তার প্রতিবাদ করল। 'সত্য হচ্ছে পৃথিবীর সকলে যেটা সত্য বলে মেনে নেয়। যেমন ধর, তুমি চুরি করনি। কিন্তু চোরাই মাল তোমার বাড়িতে পাওয়া গেছে! লোকে কি তোমাকে চোর বলে সন্দেহ করবে না ?'

'মনে করতে দাও, আমি গ্রাহ্য করিনা।' নবীন রুক্ষ মেজাজে আবার বলল, 'আমি তো অন্তরে অন্তরে জানি যে আমি চুরি করিনি।'

'তুমি একজন লেখক। সেইজন্যই তুমি অনেক আজে বাজে কথা বল।' মদনমোহন বলল।

তিন বন্ধুর সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে নবীনের সামনে সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ক্লীনারের মুখটা ভেসে উঠছিল। ক্লীনার কিরকম নির্লজ্জের মত তার দিকে তাকিয়েছিল। বোধহয় মনে করেছিল অচল সিকিটা তার। কিন্তু নবীনের স্থির বিশ্বাস তার সিকিটা সচল। সে ক্লীনারকে দেবার আগে ভালো করে দেখে নিয়েছিল।

'দস্তয় ভস্কির লেখা উপন্যাস "ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট" এর নায়ক রাসকোল-নিকভ জানত যে সে অপরাধ করেছে।' নবীন তর্ক করবার জন্য একটা সূত্র তুলে ধরল। 'কেউ তার অপরাধ সম্পর্কে জানত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিবেক তাকে নির্দোষ বলে মেনে নেয়নি। যেখানে সে খুনটা করেছিল সেই জায়গাটায় সে আবার গিয়েছিল। খুব ভালোভাবেই সে জানত সেখানে তাকে ফাঁদে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আর যখন তাকে কোর্টে অপরাধী সাব্যস্ত করা হল তখন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার বিবেকের উপর থেকে যেন ভারি বোঝা নেমে গেল।'

'দুর ছাই, কোন্ দেশে তুমি বাস করছ, সেটা জান?' মদনমোহন উত্তর দিল, 'এখানে অভিজ্ঞ চোরেরা সম্মান পায়। জীবনের হৈ-চৈ-এর মধ্যে নিজেদের বিবেকের স্বর কেউ শুনতে পায় না।'

'আরে শোন শোন, আজ একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা বলছি।' নবীন বলল, 'তারপর তোমরা বিচার করবে, দোষী আমি না অন্য কেউ!'

রাকেশ সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'অতি উত্তম প্রস্তাব, শুরু কর।'

নবীন বিস্তারিতভাবে অচল সিকিটার ঘটনা বলতে শুরু করল। '....ক্লীনারটা বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিত আমার দিকে তাকাল। আমি অচল সিকিটা ওর কাছ থেকে নিয়ে সহজেই একটা ভালো সিকি ওকে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি নির্দোষ।'

'কিন্তু অন্য যাত্রীরা তোমাকে কি নির্দোষ বলে মনে করেছিল?' রাকেশ জিজ্ঞাসা করল।

'আমি সেই ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত নয়। বোধ হয় ক্লীনারের মত অন্যরাও

ভাবল আমি দোষী।'

'নিশ্চয় তুমি ঐ ব্যাপারে আর ভাবোনি ; কারণ বিবেক তোমার পরিষ্কার।'

'হতেই হবে' মদনমোহন ঠাট্টা করল, 'তুমি বলছ তোমার বিবেক পরিষ্কার, তাহলে কেন ঘটনাটা তোমার মনে খচ্‌খচ্‌ করছে।'

নবীন চশমাটা খুলে চোখ দুটো পরিষ্কার করে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলাম কারণ আমি যে সত্যপথে আছি সেটা যাচাই করে নিলাম। আরও একটা কথা না ভেবে পারছিনা, আমারও স্বভাবের কিছু সংশোধন করে নিতে হবে। নাহলে আমি ক্লীনারের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারবো না।'

'তুমি তো নির্দোষ, এ সম্পর্কে এত চিন্তা করছ কেন ?' রাকেশ বলল।

'কারণ প্রকৃত দোষীর লজ্জা বলে কিছু নেই, সেইজন্যে।' নবীন চশমাটা পরে বলল, 'যাই হোক, ঘটনাটা এখন ভুলে যাওয়া যাক। কোন কিছুর দাগ যেন মনে না থাকে।'

৪

ফাটা ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে চেটে চন্দ্রকান্ত তার পাঁচ বছরের ছেলেকে বলল, 'মুন্না, তোমার মাকে খাবার দিতে বল।'

চন্দ্রকান্ত বারান্দায় একটা খাটিয়ায় বসে খুশীমনে পা দোলাচ্ছিল। ক্লীনারের কথা মনে হওয়াতে সে নিজের মনেই হেসে উঠল। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে চার পাই-এর উপর শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আলো আঁধারে আস্তে আস্তে তেল ফুরিয়ে যাওয়ার মত দিনের আলো নিভে গেল। আর আকাশে ফুটে উঠল অজস্র তারা।

যাক. ভালোয় ভালোয় একটা দিন কাটল। যদি সে গাড়ি বিক্রির দালালীর কাজটা শেষ করতে পারত তাহলে দিনটা আরো ভালো লাগত। হয়ত আর একটা দিন বিনা কাজে যাবে। চাঁদনীচকেও আজ তার কোন লেনদেন হয়নি। তার একটা সান্ত্বনা থাকত যদি ঐ ভদ্রলোক দশটা সাইকেল কিনতো কিংবা মাসুদ একশ গ্রোস স্ক্রু কিনতো। তার পক্ষে খুবই আফশোষের ব্যাপার যে অন্যান্য দালালরা তার অনেক আগেই কেনাবেচার খবরগুলো পায়। সাধারণত কারবার শেষ হবার পরেই সে সেখানে গিয়ে পড়ে।

ছেলেটি তার খাবার নিয়ে এল। সে উঠে পড়ল। 'জল নিয়ে আয়।' বলতেই ছেলেটি আবার চলে গেল।

সে খেতে আরম্ভ করল। খেতে খেতে সে ভাবতে লাগল, মিঃ মেহতা মনে

হয় টোপ গিলবে।....গাড়িটা কিনবে। লোকটাকে পয়সাওলা বলে মনে হয়।

যাক্ একটা কাজ সে ভালোভাবে করতে পেরেছে। অচল সিকিটার হাত থেকে সে পরিত্রাণ পেয়েছে। খুব চালাকি করে চালানোর ফলে শালা ক্লীনারকে একেবারে বোকা বানানো গেছে। সে বুঝতেই পারেনি কোন ভাগ্যবান যাত্রী তাকে ওটা দিয়েছে। সে যদি বাসে আসত তবে তার সাড়ে চার আনা খরচ হত এবং সে যে সিকিটা হাত বদল করতে পারত এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। দুপয়সাতো বাঁচলোই উপরন্তু লাভের মধ্যে অচল সিকিটার একটা ব্যবস্থা করতে পেরে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেল।

খাওয়ার পর সে একটু বেড়াতে বেরুল। বাড়ি ফিরে সে মনের আনন্দে এমন ঘুম ঘুমালো যে কখন সকাল হয়েছে জানতে পারেনি।

সাধারণত সে সকালে বেড়াতে যায় না। কিন্তু আগের রাত্রে ভালো ঘুম হওয়াতে ভোরের টাটকা বাতাসে তার মনটা একেবারে হাল্কা বোধ হল। সে তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। আর অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গিয়েই উপস্থিত হল। হঠাৎ সে দেখল গতকালের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। শিখ ড্রাইভার নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে দুজন লোকের সঙ্গে তর্ক করছে।

ঘটনাটা জানবার জন্য সে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখল যে দুজন তর্ক করছে তারা গত সন্ধ্যায় তারই সহযাত্রী ছিল।

শীতকাল সবে চলে গেছে। মাঝে মাঝে এক ঝলক দক্ষিণ হাওয়ার পুলকে বসন্তকালের আমেজ পাওয়া যায়। সূর্যের তাপ খুব কম ছিলনা তবুও চন্দ্রকান্তের খুব খারাপ লাগছিল না। সে দেখল, দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সকাল-বেলাতেই কি এক উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত।

'কেন মশায়, এই বাজে ব্যাপারটা নিয়ে এত বাত্‌চিৎ করছেন।' শিখ ড্রাইভার ত্রিলোক সিং মৃদুভাবে বলল। 'ঐ সিক্কাটা আপনার না আছে, এর ভি না আছে।' সে আঙুল দিয়ে দুজনের বুকের উপর টোকা মেরে বলল, 'ওটা যিখানে যাবার সিখানে চলে গেল, উ লিয়ে আপনারা এখন এতো ঝগড়া করছেন কেন?'

চন্দ্রকান্ত চুপিসারে নবীনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। নবীন মাথা ঘুরিয়ে নবাগতকে দেখে আবার ত্রিলোক সিংকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কিন্তু আমি বলছি, এটা আমার। তুমি অবশ্য সেটা ফেলে দিয়ে ভালোই করেছ। কিন্তু আমার কাছ থেকে পাওনাটা নিশ্চয় নেবে। নিয়ে নাও?'

'না ভাই, তা হবে না।' মদনগোপাল প্রতিবাদ করে বলল, 'ঐ সিকিটা আমার। এই ভদ্রলোক বিনা কারণে নিজের ঘাড়ে দোষ নিচ্ছেন। এই যে, পয়সাটা নিয়ে আমায় যেতে দাও সর্দারজী।'

চন্দ্রকান্ত বুঝতে পারছিল না ঘটনাটা ঠিক কি দাঁড়াচ্ছে, এত কথা কাটাকাটিই বা কেন? কেনই বা দুজন লোক পয়সাটা দেবার জন্য এত আগ্রহী! সে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের এক পাশে।

ত্রিলোক সিং বলল, 'এই যে তিসরা আদমি ইখানে এসে গেছেন। মালুম হচ্ছে ইনি ভি বলতে পারেন সিকিটা ঐ লোক দিয়েছেন।'

চন্দ্রকান্ত অসোয়াস্তি বোধ করছিল। সে দু এক পা পেছিয়ে এসে মনস্থির করে ফেলল। 'হ্যাঁ, পয়সাটা আমারই ছিল।' সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

ত্রিলোক সিং হেসে ফেটে পড়ল। কতকগুলো আলগা চুল দাড়ির মধ্যে ঠিক করে রাখতে রাখতে সে বলল, 'লেকিন আপনারা সোবাই জানেন তিনটে অচল সিকি হামার পাশ নেই আছে—বাত হচ্ছে একটা লিয়ে। আউর সিক্কা ভি হামার পাশ নেই আছে। সিটা এখন উধার গাড্ডাকা অন্দর ঘুসিয়ে আছে। হাম ফেঁক দিয়েছি। মেহেরবানি করকে আপনা-আপনা কামমে চলিয়ে যান। উ সিকিকা মামলা খতম করে দেন।'

নবীন চটে উঠল, 'বাঃ এটা কি করে হয়, একজন একটা দোষ করল, অপরে তারজন্য শাস্তি পাবে? কেন তুমি তারজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে?'

'তব আপনা আপনা সমঝোতা করে লিন।' ত্রিলোক সিং দৃঢ়ভাবে বলল, 'যো আদমি উ সিকি দিয়েচে, এখন সে পয়সা ফিরতি দিক। সবকিছু মিটমাট হোয়ে যাবে।'

নবীন এবং মদনগোপাল নিজেদের মধ্যে তর্ক করেই চলল। তারপর চন্দ্রকান্ত তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনারা বিনা কারণে তর্ক করছেন।' সে বলল, 'আমি আপনাদের একটা উপায় বলে দিচ্ছি। মনে করা যাক, আমরা প্রত্যেকেই অচল সিকি দিয়েছি। কিন্তু ড্রাইভার দাবি করছে সে নাকি একটা সিকি পেয়েছে। সেইজন্য আমাদের উচিত সবাই মিলে তাকে একটা সিকির পয়সা দেওয়া।'

'সাবাস, ই তো আচ্ছি বাত আছে।' ত্রিলোক সিং বলল।

'তবে তাই হোক।' নবীন বলল, 'নিন এই দুআনা পয়সা আমার ভাগ।'

'দুআনা পয়সা নয়—মাত্র পাঁচ পয়সা'—চন্দ্রকান্ত বলল, আর আপনিও আমাকে পাঁচ পয়সা দিন।'

মদনগোপালের কাছে ছপয়সা ছিল। সে সব্জি কিনে ফিরছিল। সে বলল,

আপনি ছপয়সা নিন—নাহলে আপনার একটা পয়সা কম পড়বে।'

'আরে জী, এক পয়সা লিয়ে কেন ঝামেলা করচেন—ছোড়িয়ে সাব।' ত্রিলোক সিং টিপ্পনী কেটে বলল, 'যদি হামি চার আনা ক্ষতি মানতে পারি, তব এক পয়সাকা লিয়ে ক্যা হোগা—মর যায়গা ?' বলে সে হাসতে লাগল।

'না, আপনি পাঁচ পয়সাই দেবেন। আমি দেব ছয়।' চন্দ্রকান্ত বলল।

'কেন ?' নবীন বলল, 'কেন আপনি ছ পয়সা দেবেন ?'

'আভি মামলা খতম। কেতনা টাইম ই ঝগড়া চলবে ?' ত্রিলোক সিং ব্যঙ্গ করে বলল।

চন্দ্রকান্ত রেগে গিয়ে বলল, 'আমি ছ পয়সা দেব হ্যাঁ ছ পয়সা, তার চেয়ে এক পয়সা কম নয়।'

সে এত জোর দিয়ে বলল যে নবীন এবং মদনগোপাল চুপ করে গেল। নবীনকে তিন পয়সা ফেরত দিয়ে চন্দ্রকান্ত পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ফেলল। সে পয়সা পকেটে করে নিয়ে এসেছিল মিষ্টির দোকান থেকে পুরি খাবে বলে। এখন তার কাছে দু আনা আর দু পয়সা রইল।

ছ পয়সা খরচ হওয়াতে চন্দ্রকান্তের বিশেষ মন খারাপ হল না। তার পরিবর্তে —সে খুশীই হল—যেন একটা বড় বোঝা তার বুক থেকে নেমে গেল।

অন্ধকারের অন্তরালে

নির্মল ভর্মা

বানোকে তিনটি পাকদণ্ডী পরিয়ে তবে আমাদের বাড়ি আসতে হয়। ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে বলল, 'কোন খবর আছে?' আমার ইচ্ছে হল, মিথ্যে কথা বলি, হ্যাঁ খবর আছে। সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি দিল্লী যাব। কিন্তু আমি কিছু বললাম না। বানো বুদ্ধিমতী। মিথ্যে বললেও সে মেনে নিত না। আমি তাই চোখ বুজে শুয়ে রইলাম।

প্রতিবারের মত সে কাছে এসে আমার কপালে হাত রাখল। যখন তার হাত ঠাণ্ডা মনে হত, তখন জানতাম আমার জ্বর কমেনি। কিন্তু যখন গরম বোধ করতাম, তখন উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। আগ্রহ ভরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, 'বানো তোমার কি মনে হয় আমি ভাল হয়ে উঠছি?' নিরাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও আমাকে বলত, তোমার তাপমাত্রা সন্ধ্যের দিকে নিশ্চয় উঠবে। আমার তাপমাত্রা নেমে গেলে সে মোটেই খুশী হত না। সে জানত যতদিন আমার জ্বর না কমে ততদিন আমি তাকে ছেড়ে দিল্লী যাব না এবং সিমলায় থাকতে বাধ্য হব। যখনই আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই তখনই একটা ভিজে তোয়ালে কপালেব উপর রেখে দিই। আমি তার হাত ধরে কপালের উপর বুলিয়ে নিয়ে বলি, 'আমার কপালটা দেখ, ঠাণ্ডা। তাই নয়কি?' কথা না বলে বানো জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

দূরে আবছা নীল আবরণে মোড়া অরণ্য আর শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি। বাতাসে জানলার পর্দা উড়িয়ে নিয়ে যেত, বহুদূর থেকে ভেসে আসা স্বপ্নের মত সুগন্ধে সারা ঘর ভরে যেত।

'ঐ পাহাড়গুলোর পিছনে দিল্লী। নিশ্চয় তুমি জান।' আমি বললাম।

বানো মাথা নাড়ল। দিল্লী সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ ছিল না। আর ওই শহরেও সে কোনদিন যায়নি। তার বাবার অফিস সিমলাতে। সারা বছর এখানেই থাকতে হয়। তাকে দেখে করুণা হয়।

'বানো, তুমি আমার ভাগের ফুলগুলো নিতে পার।' চোখ না খুলেই আমি তাকে বললাম।

'কে তোমার পচা কুল খেতে যাবে?' সে রেগে বলল। 'দিল্লী যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেও—তোমার মহামূল্যবান পচা কুলের বাক্স।' তারপর সে বারান্দায় চলে গেল।

আমার বেশ রাগ হল। যখন কেউ অসুস্থ হয়, রাগ চরম সীমায় উঠে গেলে তার মাথার ঠিক থাকে না। অসুস্থতার সময় আবেগটা খুব বেড়ে ওঠার আগেই ধীরে ধীরে কমে যায়। কারুর যদি কান্না আসে, চোখ দিয়ে জল পড়বে না—শুধুমাত্র চোখের পাতাগুলো কাঁপবে। কেউ যদি খুব উল্লসিত হয়, খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু তার বুকের আওয়াজ হবে না, কেবল মাত্র ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকবে।

যে বাড়িটায় বানো এতক্ষণ ছিল অর্থাৎ যেখানে সে এতক্ষণ ছিল, সেটাকে সে প্রায়ই আমাদের বাড়ি বলে উল্লেখ করে। সেটা একটা হানা বাড়ি। সারা বছর খালি পড়ে থাকে। শোনা যায়, একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা এই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল। বাড়িটার কলঘরে আমরা কাঁচাকুল এবং খোবানি জমা করে রাখতাম। আমরা যে বাড়িটায় গোপনে যাতায়াত করি তা কেউ জানত না।

অনেকক্ষণ ধরে বানো বারান্দার দোলনায় দুলছিল। দোলবার সময় যখন উপরে উঠছিল, তখন তার সালোয়ার বেলুনের মত ফুলে উঠছিল। দোলনার ক্রীক্ ক্রীক্ শব্দ আমার কাছে যেন ঘুমের ওষুধের কাজ করল। আমার ঝিমুনি এসে গেল। আর সেই আধো ঘুমে আমি যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আমার মনে পড়ে যখন যা কিছু স্বপ্ন দেখেছি, সব দুপুর বেলায়। আমি স্বপ্নে দেখলাম বাবার খাবার নিয়ে যাবার জন্য অফিস থেকে চাপরাশী এসেছে। সে হেসে আমাদের বলল যে আমরা খুব তাড়তাড়ি দিল্লীতে ফিরে যাব। তারপর আমি দেখলাম বানো হানাবাড়ির জানালা দিয়ে খোবানি ফেলে দিচ্ছে। যে ইংরেজ মহিলাটি ওখানে আত্মহত্যা করেছিল তাকে যেন দূরের পাহাড়ে বসে থাকতে দেখলাম আবার তাকেই দেখলাম যেন কালকা-সিমলা ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে ঝুলে আছে। লম্বা হাত বাড়িয়ে বানো খোবানিগুলো ফেলে দিয়েছিল সেগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে নিচ্ছে।

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বানো অনেকক্ষণ হল চলে গেছে।

সন্ধ্যের সময় মা চা নিয়ে এলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দুপুরে কি বাবার চাপরাশী এসেছিল?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। কেন রে?'

'তোমাকে কি কিছু বলে গেল?'

'না কিছুই না। ব্যাপারটা কি?'

ছোট কানের জন্যই তুমি এত আগে মারা গেলে।

সময় সময় মনে হত, আমার অসুস্থতার জন্যে তিনি মোটেই চিন্তিত নন। অনেক সময় তিনি বোধহয় ভুলে যেতেন আমি অসুস্থ কি না। আমি আরও জানতাম তিনি দিল্লী ফিরে যেতে বিশেষ আগ্রহী নন। এক সময় এই ধরণের কথা বীরেন কাকাকে বলেছিলেন শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

বেশ কয়েকমাস মা এবং বাবা আলাদা ঘরে বাস করছিলেন। দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আরও অনেক রহস্য ছিল। আমি সেগুলো গবেষণা করার চেষ্টা করিনি। আমি তাদের স্মৃতির পাতায় থেকে বাদ দিয়েছিলাম।

মায়ের ঘর গ্যালারির শেষ প্রান্তে এবং তার ঘরের দুটো জানালা আমার ঘর থেকে দেখা যায়। মাঝে মাঝে সূর্যের সোনাগলা রঙের চুলগুলো নিয়ে জানলার ধারে তাকে বসে থাকতে দেখা যেত। আমি জানতাম তিনি জানালায় বসে বই পড়ছেন।

তাঁর অনেক বই ঘরের চারদিকে ছড়ান থাকত সোফার উপর, বালিশের পাশে, খাটের তলায়। খুব সম্ভব, তিনি খুব কম ঘুমোতেন। প্রায়ই আমি দেখতাম অনেক রাত অবধি তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে।

একদিন তাঁর একটা বই খুলে দেখেছিলাম। বই-এর প্রথম সাদা পাতায় নীল কালিতে মাকড়সার জালের মত বীরেন কাকুর নাম লেখা আছে। আমার খুব ভাল লেগেছিল। পরে মায়ের ঘরে পড়ে থাকা অনেকগুলো বই-এর মধ্যে তাঁর নাম লেখা দেখেছিলাম।

বীরেন কাকার নাম দেখার পর আমার মনে পড়ল তাঁর সেই ছোট্ট ঘরের কথা। আমি এবং মা একদিন সেখানে গিয়েছিলাম। এক ঘর বই। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে এবং তাকের উপরও অসংখ্য বই, সেগুলো প্রয়োজনে নামাবার জন্যে একটা সিঁড়ি দাঁড় করানো আছে। আর একটা ঘরের দেওয়ালে নানা আকারের ফ্রেমে বাঁধা ছবি। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে পারি। বাবা বলেছিলেন বীরেন কাকা যুদ্ধের আগে এই ছবিগুলো ইউরোপ থেকে কিনে-ছিলেন। বীরেন কাকাকে দেখে আমার মনে কেমন করুণা এবং বিস্ময় জাগতো। সারা বছর শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ই কি করে একা এই নিরালা বাড়িতে এই বইগুলো নিয়ে তিনি সময় কাটাতেন।

বাবার বন্ধুদের মধ্যে বীরেন কাকার একটি নিজস্ব সত্বা ছিল। একমাত্র তাঁকেই বাবা আমার ঘরে এনে চা খাবার নিমন্ত্রণ করতেন। অন্যান্য লোকদের বৈঠকখানায় নিয়ে বসতেন। প্রথম বীরেন কাকা যখন এখানে এসেছিলেন,

আমি তখনও শুয়ে পড়েনি। তাঁরা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং আমি সেখানে থাকতে অনুমতি পেয়েছিলাম। সেই সন্ধ্যেটা সুন্দর ভাবে কেটেছিল।

একদিন সন্ধ্যায় বীরেন কাকা আমাদের বাড়ি এলেন। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি কারণ তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের জামা কাপড় পরে এসেছিলেম। লম্বা জুতো হাঁটু অবধি উঠে আছে, একটা খাকি চামড়ার থলে তাঁর এক কাঁধে ঝুলছে, অপর কাঁধে একটা ক্যামেরা, সোলার টুপি মাথায়, সব মিলিয়ে এক চমকপ্রদ সজ্জা। তার উপর ছাগল দাড়ি যেটা তার মুখে মোটেই মানাচ্ছিল না। এই ধরণের সাজ করা সত্ত্বেও তার পকেট থেকে মোটা বই উঁকি মারছিল।

তিনি আমার বিছানার কাছে এসে করমর্দন করলেন। বীরেন কাকা সব সময়ই করমর্দন করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি কখনই আমার শারীরিক কুশলতার কথা জিজ্ঞাসা করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সময় নষ্ট করতেন না।

মা আমাদের পাশে বসে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বীরেন কাকুর দিকে একটা চোরা চাহনি দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। বীরেন কাকা বললেন যে তিনি কুফরী যাচ্ছেন, রাতে 'রেষ্ট হাউসে' থেকে পরদিন সন্ধ্যায় ফিবে আসবেন। 'আমাকে ওরা বলেছে যে রেষ্ট হাউসের রক্ষী গত তিরিশ বছর ধরে সেখানে আছে, সে নিশ্চয় কুফরী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে।' বীরেন কাকা বললেন।

একটা মৃদু হাসি মার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি মুখের দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'অনেকেই মনে করতে পারবে না কত বছর ধরেই এই খেলা নিয়ে আছ।'

'ওহো! সেই জন্য তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। তবে আমার লেখা মন্তব্যগুলো দেখো।' বীরেন কাকার চোখ জ্বলে উঠল। যে কোন প্রকারে তার বই "সিমলার ইতিহাস"-এর উল্লেখ হলেই মার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ত।

বীরেন কাকা বললেন, 'আমার বই-এর জন্য কোন খবরের সন্ধান পেলে আমি সংগ্রহ করে থাকি।'

'কি রকম ধরণের খবর কাকা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমি সব সময়েই কাকার বই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকি। তাতে তাঁর কাজের উৎসাহ বেড়ে ওঠে।

একবার আমি একটা পুরনো ফটো দেখেছিলাম। বীরেন কাকা বললেন, 'কোন ইংরেজ সেটা তুলেছিল।'

'ছবিটা কার?' মা সেলাই করতে করতে মাথা তুলে বললেন।

রেস কোর্স মাঠের একটা ভিড়ের ছবি। বেশির ভাগ মুখ অস্পষ্ট। কিন্তু মাত্র একটা মেয়ের ছবি পরিষ্কার উঠেছিল। সে তাঁবুর পাশে হাতে একটা ছাতা ধরে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকের চোখ ঘোড় দৌড়ের দিকে নিবদ্ধ ছিল কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল পিছন ফিরে কাউকে যেন দেখছে। যেন গ্রাণ্ড কোরাসে একটা বেখাপ্পা সুর। ঠিক এ রকম করে পিছন ফিরে তাকিয়ে আছে,....

হঠাৎ বীরেন কাকা থেমে গেল। ততক্ষণে মার হাতের সেলাই বন্ধ হয়ে গেছে।

সেই ছবিটার তলায় শিরোনামা ছিল 'আনন্দ ভেল' সিমলা—১৯০৩ পঞ্চাশ বছরের আগের ছবি। এখনও সেই মেয়েটি ছাতা হাতে ধরেই পিছন ফিরে তাকিয়ে আছে।

বীরেন কাকা হাসল। যেন নিজের খেয়ালেই তিনি আছেন। মা ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকালেন। আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই বীরেন কাকা কেন অর্থশূন্য কথা বলেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে করি শহরের সম্পর্কে লেখার চেয়ে মানুষ সম্বন্ধে লেখা সহজ। বীরেন কাকা বলতেন, 'আমি বহু টিকা টিপ্পনী জোগাড় করেছি, পুরনো ছবি, সিমলা সম্পর্কে ভ্রমণ কাহিনী। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আমার বই আমি কখনো লিখতে পারবো কি না।'

'কেন ?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কারণ....কারণ প্রত্যেক শহর নিজের মধ্যে নিজেই মিশে আছে। এই গোপনীয়তা বাইরে থেকে সহজেই উঁকি মেরে খুঁজে নিতে পারা যাবে না।' বীরেন কাকা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন।

'এখানে আসার আগে আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এসেছি।' তিনি নীচু হয়ে আমাকে বললেন, 'ডাক্তার বলেছে তুমি কিছুদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে হেঁটে চলে বেড়াতে পারবে।'

'তুমি কি উঠে বসবে ?' কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে উনি বললেন, 'আমি তোমার একটা ফটো তুলব। দেখি ছবিতে তোমায় কি রকম দেখায়।'

আমার ফটো তোলার পর হাঁটার ছড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে গেলেন।

'কখন তুমি আবার ফিরে আসবে ?' এই প্রথম মা তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'বোধ হয় কাল সন্ধ্যেবেলায়—আমি এক মিনিটের জন্য হলেও দেখা করে যাব।' কাকা মার দিকে যখন তাকালেন মনে হল মার চোখ চিক্ চিক্ করে উঠল। তারপর মা মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

'বীরেন কাকা ?....' আমি লজ্জায় বলে ফেললাম।

'বল, খোকা ?'

'আমি একটা ছবি তুলব।'

তিনি হেসে ক্যামেরাটা আমার হাতে দিলেন।

আমি মার দিকে তাকালাম।

'না না, আমার ছবি তুলতে হবে না।' মা জড়িয়ে জড়িয়ে কথাগুলো বললেন।

'তোমার একার তুলব না। বীরেন কাকাও তোমার সঙ্গে থাকবেন।' বীরেন কাকার মুখ পাংশু হয়ে গেল। চোরা চাহনি দিয়ে তিনি মাকে একবার দেখে নিলেন। কোন হৈ-চৈ না করে চেয়ার থেকে উঠে আমাকে মা বললেন, 'তুমি খুব একগুঁয়ে।'

'বীরেন কাকা তুমি রেলিং—এর ধারে দাঁড়াও—হ্যাঁ রোদ্দুরের দিকে তাকাও। আর মা, তুমি ডান দিকে দাঁড়াও।' আমি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম এবং দেয়ালের ধারে কাত হয়ে দাঁড়ালাম। আমার মাথা ঘুরে গেল। কিন্তু ছবিটা মনে হল খুব ভাল হয়েছে। আজও আমার কাছে সেই ছবিটা আছে।

আমি বুঝতে পারিনি কখন ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেছে। বীরেন কাকা অনেকক্ষণ চলে গেছেন। আমার চেয়ারে হেলান দিয়ে মা একা বসে আছেন—নিশ্চল, নিশ্চুপ। আমি আলো জ্বালাতে বারণ করলাম। ঘরটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। এই অনুভূতিটা আমার খুব ভাল লাগছিল।

হঠাৎ বিশেষ সন্ধ্যার স্মৃতি আমার মনে জেগে উঠল। আমার অসুস্থ হবার অনেক আগেকার ঘটনা। মা আমাকে বীরেন কাকার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বীরেন কাকা আমাদের দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। চোরা দরজা খুলে আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিলেন এবং অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

'পোনো, তুমি এখানে ?' এই প্রথম বীরেন কাকাকে মায়ের নাম ধরে ডাকতে শুনলাম। তাঁর মুখে মায়ের নাম কেমন অদ্ভুত শোনাল। মা হাসতে লাগলেন। আমি জানি না কেন, তাঁর এই ধরণের হাসি আমার ভাল-লাগলো না। গায়ে কাঁপুনি ধরল এবং আমার মনের উপর একটা অবশ ভাব নেমে এল।

. আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। মা বললেন, 'ভেবেছিলাম পথে দেখা পেয়ে তোমাকেই হয়ত ডাকতে হবে।' মায়ের মুখে প্রথম মিথ্যে কথা শুনেছিলাম।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বীরেন কাকার নীল চোখে সন্দেহের মেঘ জমে উঠতে দেখলাম। তারপর তিনি আমার হাত ধরে তাঁর বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন।

এই প্রথম আমি তাঁর লাইব্রেরি দেখলাম। তিনি আমাকে সিমলার পাহাড়ের চূড়া, উপত্যকা এবং ঝর্ণার ফটো দেখালেন। তাঁর পরিকল্পিত বই-এর জন্য এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। স্তূপীকৃত বই-এর পাশে টেবিলের উপর একটি সবুজ ঢাকনা দেওয়া আলো ছিল। তিনি কোথা থেকে যেন দুটো চকোলেটের টুকরো বের করে আনলেন। তাঁর হাত সাফাই সম্পর্কে আমি তৈরী ছিলাম না। তাই আমার অস্বস্তি দেখে তিনি হাসতে লাগলেন। 'আমার কাছে অনেক চকোলেট মজুত আছে। যখন আমি বরফের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাই, সেই শীতের সময়, আমার হাতের কাছে সব সময় চকোলেট থাকে।' তিনি বললেন। আমি বীরেন কাকার দিকে তাকালাম। বাবার সঙ্গে তাঁর কত পার্থক্য! আমি বাবার যে ধরণের মেজাজ দেখি, তাঁর সে সব কিছুই নেই। বীরেন কাকার কথায় একটা স্নেহের স্পর্শ ছিল। বিচিত্র দাড়ি, স্নিগ্ধ চাহনি—সব কিছু মিলিয়ে, তাঁর মুখটা যেন এক রহস্যের আবরণে ঢাকা।

'তুমি কি খুব কাছ থেকে বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো দেখেছ?' তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি মাথা নাড়লাম।

'বরফ দেখতে নীল।' তিনি বললেন, 'আমি একটা রঙিন ফটোগ্রাফ তুলে-ছিলাম....'তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি টেবিলের উপর পড়ে থাকা অ্যালবামটার পাতা অলসভাবে দেখতে লাগলাম। প্রত্যেকটি ছবি সিমলার দৃশ্য সম্বলিত। প্লেন, জাকু, ছোটউইক জলপ্রপাত আরো কত-দৃশ্যের জগৎ। সমস্ত জায়গাগুলো আমি সহজেই চিনতে পারছিলাম। কাকা তখনও না আসাতে আমি অন্য একটা ছোট অ্যালবাম, যেটা বইয়ের তাকের কোণের দিকে পড়েছিল সেটা তুলে নিলাম। আর প্রথম পাতা খুলতেই, একটা চেনা মুখ আমার দিকে চেয়ে রইল। সেটা আমার মায়ের ছবি।

মা কি কোনদিন এরকম ছিল দেখতে? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। একই চওড়া কপাল কিন্তু তার মধ্যে একটা লাল সিন্দুরের টিপ ছোট করে দেওয়া আছে। মা আজকাল কিন্তু সিন্দুর দেন না। দুটি চুলের গুচ্ছ দুই কাঁধে বিছিয়ে আছে। পুরো হাতা সোয়েটার গায়ে এবং এখনকার মতই ছোট কান দুটি চুলের তলায় লুকানো। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল এই চোখ মুখ আমার অথবা বাবার দিকে তাকাবার জন্যে নয়। ছবিটা আমার মায়েরই, কিন্তু ছবির মধ্যে আমার মাকে খুঁজে পেলাম না!

বীরেনকাকার পায়ের শব্দ পাওয়াতে আমি ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি অ্যালবামটা স্বস্থানে রেখে দিলাম।

তারপর আমরা যখন বেরিয়ে বাগানে গিয়ে বসলাম তখন সন্ধ্যার ছায়া নামতে আরম্ভ করেছে। গায়ে শাল জড়িয়ে মা একটা পাথরের বেঞ্চে বসেছিলেন। বীরেন কাকা মায়ের পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে পড়লেন। মা আমাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' আমি তাঁর মুখে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। সেই একই চোখ, মুখ, কপাল, আলাদা ভাবে দেখলে ফটোর সঙ্গে খুব মিল আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে কেন যে অন্যরকম দেখাচ্ছিল তা আমি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো না। বোধহয় তাঁর মুখের সেই ভাব বহুদিন পূর্বেই উধাও হয়ে গেছে। আমরা কোনদিনই তা আর দেখতে পাবো না।

মাথার কোঁকড়ানো চুলে মা আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, 'কি হয়েছে বাবা?' আমার বুকে কাঁপুনি ধরলো, অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

মা আর আমার দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আমি নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে বসেছিলাম। আমাদের এখানে আসার পর থেকে বীরেন কাকা মার সঙ্গে কোন কথা বলেন নি। ওটা খুব অদ্ভুত মনে হলেও, কথা না বলার সঠিক কারণ বুঝতে পারিনি।

বাগানের উপর নীলাভ কুয়াশা নামছে। দূরের পাহাড়ের কোলে আলোগুলো জোনাকির মত দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের সীমানাগুলো অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়াতে মনে হচ্ছিল আকাশটা পৃথিবীর বুকে বাসা বেঁধেছে।

আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, এই বিশেষ একটি সন্ধ্যার কথা প্রায়ই মনে পড়ত যদিও অন্যান্য সন্ধ্যার তুলনায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি যে মনে করে রাখতে হবে। বীরেন কাকা আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুদূর আসার পর মা তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে এরপর আমাদের বাড়ি ফিরতে কোন অসুবিধে হবে না। তাড়াতাড়ি আমি এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে তাকালাম। মাকে সেখানে দেখলাম না। আমি আবার পিছিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মাকে খোঁজ করতে লাগলাম। আমার বুক ধড়ফড় করছিল।

রাস্তার বাঁকের কাছে মাকে দেখলাম একটা রেলিংএর উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাসে তাঁর শাড়ি পত্ পত্ করে উড়ছে। তার নিচে বীরেন কাকার বাড়ির দিকে তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িটাকে বড় নির্জন এবং পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। একটা আবছা আলো লাইব্রেরির জানালা থেকে বাগানের উপর পড়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর মা হাঁটতে শুরু

করলেন। তিনি এত আস্তে হাঁটছিলেন যে মনে হচ্ছিল ঘুমের ঘোরে হাঁটছেন।

তিনি আমার কাছে পৌঁছে অসহায় ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর ঠাণ্ডা ও শুকনো ঠোঁট দিয়ে চুমু খেলেন।

কিছুদিন পরে বুঝতে পারলাম আমার অসুস্থতার লক্ষণ মুখের বিস্বাদ ভাবটা কমে যেতে আরম্ভ করেছে এবং হাতে পায়ের জোর আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আমি জানালা খুলে রাখতাম, পর্দাগুলো তোলা থাকত। সূর্যের নরম আলোয় আমি শরীরটা মেলে দিতাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। আমার থেকে কিছু দূরে খুড়ীমা জামা কাপড় ধুয়ে কাঠের বেড়ার উপর ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন। চুপি চুপি গুঁড়ি মেরে তাঁর পিছন দিক দিয়ে বাবার ঘরের পিছন দিককার ঝুলন্ত বারান্দায় হাজির হলাম। সেই ঘরের অপর প্রান্তে দরজা জানলাগুলো বন্ধ ছিল এবং তাতে কোন পর্দা ঝুলত না। মা যখন তাঁর খুড়ীর বাড়ি যেতেন, বাবা মার ঘরে চাবি দিয়ে নিজস্ব জিনিসপত্র নিয়ে উপরতলায়, পড়ার ঘরে, রাত কাটাতেন।

ঝুলন্ত বারান্দা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত। আমার জানালার সামনে স্কুলের উঠোন। ছোট ছোট বই রাখবার থলি হাতে, সারিতে চারজন করে ছাত্ররা সব উঠোনে এসে দাঁড়াতো। আমি বাচ্চা ছেলেদের দেখতাম, তারা নাকি এক সুরে প্রার্থনার গান গাইত। আমরা অতিরিক্ত পাওয়ার আগ্রহে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি। তাদের কাঁপা সুরের কান-ফাটানো-চিৎকার সহ্য করতে না পেরে খাদের ওপারের হানা বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তারপর দৃষ্টি চলে যেত সর্পিল পথের দিকে যেটা শেষ পর্যন্ত বানোর বাড়ির সীমানা বরাবর গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে। বাবার পুরোনো হাঁটার ছড়ির মাথায় লাল কাপড়ের টুকরো বেঁধে মাথার উপর তুলে ওড়াতে থাকতাম। আমার এবং বানোর মধ্যে এটা খুব মজার খেলা ছিল। সে আমাকে দেখাত। পেলে সেও একই রকম করত। তার মাকে ডেকে আমায় দেখালে, তিনিও হাত নাড়তেন। তাঁকে দেখে আমি বিব্রত হয়ে লাঠি ফেলে দিয়ে ঘরের ভেতরে পালিয়ে যেতাম।

আমি ঘরে ঢোকবার আগেই চাকর এসে খবর দিল যে বাবা আমায় ডাকছেন। বাবার ঘরে আমার ডাক পড়াটা খুবই আকস্মিক। তাড়াতাড়ি হাতের নখগুলি পরিষ্কার আছে কিনা দেখে নিলাম। কারণ বাবা প্রথমেই আমার নখগুলো দেখেন।

বাবার ঘরের একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। সিগারেটের গন্ধ, একটা চাপা

শান্ত ভাব, অল্প আলো যা দিন রাত্রির পার্থক্য বুঝতে দেয় না। সব কিছু ছাড়িয়ে একটা তীব্র ওষুধের গন্ধ ঘরে সব সময় ছড়িয়ে থাকে।

'বাইরে তুমি কি করছ ?' আমি বাবার মেজাজ জানি। তাঁর কথায় কোন রাগের লক্ষণ ছিল না।

'আমি বানোর খোঁজ করছিলাম।' থেমে থেমে বলে চুপ করে যাই।

'বাবা।'

বাবা মুখ তুলে তাকালেন।

'আমি এখন ভাল হয়ে গেছি। আমার জ্বর ছেড়ে গেছে।'

বাবা আমার একটা হাত আর একটার উপর রেখে, তাঁর বড় লোম ভর্তি হাতের মধ্যে নিলেন। তারপর বললেন, 'আরও কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নাও।'

'বাবা, আমরা কবে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি ?' যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হত তখনই এই প্রশ্নটা আমি না করে থাকতে পারতাম না।

বাবা তাঁর মুখ থেকে সিগার নামিয়ে দেওয়াল ঢাকা কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখলেন। মনে হল সেখানে কোন লেখা উদ্ধার করেছেন।

'খোকা, তুমি কি মাঝে মাঝে ভয় পাও ?'

'ভয় ? কিসের ভয় ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বাবা আমার দিকে তাকালেন। 'আমি বলতে চাইছি যে, তোমার মা এখন চলে গেছেন।'

'কিন্তু মা তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।' আমি আশা করেছিলাম, বাবা আমার কথায় সায় দেবেন ! কিন্তু তিনি ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে যেন নিজের মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ।'

একটু থেমে আবার ডাকলেন, 'খোকা ?'

'কি বাবা ?'

'তুমি কি মার সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'. তাঁর গলার স্বর একটু ভারি মনে হল এবং প্রশ্নটাও অদ্ভুত যার কোন মানে হয় না। আমি তাঁকে ঘাড় নেড়ে কিছু বলতে চাইলাম কিন্তু উত্তর দেবার আগে চোখাচোখি হল তখন মনে হল তিনি অন্য কিছু শুনতে চাইছেন অর্থাৎ আমি যেন ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলি।

আমি মাথা নাড়লাম। আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি কোলের উপর রাখা আমার হাত সরিয়ে দিলেন। তারপর চেয়ার থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁকে যতই লক্ষ্য করছিলাম, আমার মন তাঁর জন্যে সহানুভূতিতে ভরে উঠছিল। মা আর আমার সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়ার কোন সমস্যা ছিল না। কোন রকম হৈ চৈ না করে মা আমার সব বায়না মেটাতেন। তবু আমার ভাল-বাসা তিনি পাননি, অথচ তাঁকে ভয় করতাম, কোন বায়না করতাম না কিংবা মনের কোন কথা তাকে বলতাম না। তবু তাঁর প্রতি আমার মনে দুর্বলতা ছিল। আমাদের সঙ্গে মার আলাদা হওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অস্পষ্ট লেগেছিল। তবু বাস্তবে সেটা ঘটে গেল।

বাবা নিঃসহায় দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল বাবার ঘরের নিস্তব্ধতা যেন সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছিল। মা চলে গেছেন। সমস্ত বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা এবং পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল।

আমার সঙ্গে দেখা না করে মা তাঁর খুড়ীর বাড়ি চলে গেছেন। তাঁর চলে যাবার আগে মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আমার ঘরটাতে তখন অন্ধকার ছিল। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছিল এবং আমার বালিশের উপর আছাড় খাচ্ছিল। কয়েকদিন ধরে একটা চিন্তা আমার মনে ঘোরাফেরা করছিল। ঘরের সব কিছু জিনিস তাদের জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার বিছানা সরান হয়েছে। ফলে বাঁ দিকে জানালার কাছে চলে এসেছে এবং দরজাটা ডান দিকে দু গজ পেছিয়ে গেছে। দরজা কিছুটা খোলা আছে। বাবার ঘরে খুব অল্প কাঁপা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ যেন একটা কালো পাখির ডানার ধাক্কায় দরজাটা এক সেকেণ্ডের জন্যে খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হবার সময় একটা সরু আলোর রেখা মেঝেতে পড়ল, তারপর উল্টো দিকের দেওয়ালের উপর উঠে গেল। আমি শুনতে পেলাম দরজার পাশে কেউ জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। আমি ভাবলাম মা ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করতে এসেছেন। কিন্তু কারও দেখা পেলাম না। অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট, একটা গলার স্বর শুনতে পেলাম। তারপর এত কাছে মনে হল যেন কেউ আমার কানের কাছে চুপি চুপি কথা বলছে।

'না, তুমি ভিতরে যেতে পারো না।' বাবার গলার আওয়াজ—যেন অন্ধকারের বুকে তীক্ষ্ণ কাঁচ বেঁধার মত ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। মা কি অন্যায় করেছেন? কেন অদ্ভুত ভাবে কাঁদছেন?

'আমাকে একটু আদর করতে দাও।' মা কেঁদে বললেন।

'শোনো, আমি তোমাকে ভেতরে যেতে দেব না।'

'আমাকে আটকাবার তুমি কে? তোমার লজ্জা করে না?'

'পোনো চিৎকার করো না। খোকা ঘুমোচ্ছে।'

'আমি চেঁচাব না, আমাকে ভেতরে যেতে দাও।'

'না না, এখন নয়।'

'তুমি কি ভাব আমি পাগল? তুমি কি ভাব আমি তাকে সব বলে দেব....?'

'পোনো, তোমার ঘরে যাও। তোমার মাথার ঠিক নেই।'

বাবার আর কিছু বলার আগে পর্দাটা সরে গেল। আমার বিছানা আলোয় ভরে উঠলো। পর্দার গায়ে দুটি মার্বেল পাথরের মত হাত এবং দুঃখে পাগলের মত দুটো চোখের চাহনি মেলে এক ছায়া মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম—সরু, লম্বা আঙ্গুলে পর্দা ধরে আছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে, কাঁপা ঠোঁট দুটির উপরে নাকটা তরবারির মত চিকচিক করছে। দরজার উপর পর্দা ফেলে দেবার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভূত দেখার মত দৃশ্য দেখলাম। তারপর ফোঁপান কান্নার আওয়াজ কানে আসতে লাগল।

এরপর, আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। পর্দার পেছনে চাপা হাসির আওয়াজ পেলাম। না, মায়ের গলার আওয়াজ তো নয়। এই রকম হাসি তাকে কখনও হাসতে শুনিনি। আর কিছু শুনতে বা দেখতে পেলাম না। মন আমার তখন অসাড় হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে ন্যায় কি অন্যায়— যাই ঘটে থাকুক, আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি তখন সেরে উঠছি। একদিন বিকেলে ছাদের উপর শুয়েছিলাম। আমি কি করছি তা দেখার কেউ নেই। আমার মন যা চায় তাই করি। সন্ধ্যের পর বাবা কোনদিন আমার ঘরে আসেন না এবং বীরেন কাকাকে বহুদিন আমি দেখতে পাই না। বানোই আমার এই আরোগ্য লাভের জন্য দুঃখিত। তার ধারণা, যদি আমি অসুস্থ হয়ে থাকতাম তবে দিল্লী ফিরে যাবার সম্ভাবনা কমে যেত।

ছাদের পিছন দিকে, দুটো ছোট ছোট পাহাড় কাঁচির ফলার মত আকাশের দিকে উঠেছে। পাহাড়ের অনেকটাই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। কালকা যাবার ট্রেন যখন এটার ভিতর দিয়ে যায়, গাছের উপর দিয়ে তখন আকাশের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেতে খেতে উঠে যেতে দেখা যায়। বানো আর আমি সেদিন ঐ দিকটাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

'বানো' আমরা কয়েকদিন পরেই হয়তো দিল্লীতে ফিরে যাব।' হঠাৎ আমি বললাম। সে তখন খোবানি তুলতে ব্যস্ত। তার স্কার্ট খোবানিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসতেই, কিছু খোবানি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

'এই যে, এটা খাও' সে একটা পাকা হলদে হয়ে যাওয়া খোবানি দিয়ে বলল, 'এটা বেশ সুন্দর।'

আমি আপত্তি জানালাম। 'বাবা আমাকে খোবানি খেতে বারণ করেছেন।'

'এটা পাকা, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' সে বলল এবং আমায় উত্তর দেবার আগেই সে খোবানিটা নিজের মুখে ফেলে দিল। সেটা তার গালের একদিকে নিয়ে এসে বলল, 'যদি গালের মধ্যে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করা যায় তবে লালার সঙ্গে মিশে খুব রসাল হবে। যাক তাহলে সব ঠিক হয়ে গেছে, তুমি দিল্লী যাচ্ছ?' সে শব্দ করে খোবানি চুষতে চুষতে বলল।

'মা ফিরে এলেই রওনা হব।'

'মা তোমার কোথায় গিয়েছেন?'

'তাঁর খুড়ির বাড়িতে।'

'তুমি ঠিক জান?' রহস্যময় হাসি হেসে বানো বলল।

'বানো ঘটনাটা কি তুমি কিছু জান?' আমি হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু না, এমনি বললাম।' খোবানিটাকে দুটো ঠোঁটের মধ্যে চেপে সে আবার বলল, 'আমি তোমাকে বলব না। মা বারণ করে দিয়েছে।'

আমি মনে মনে রেগে গেলেও কোন কিছু হয়নি এ রকম ভান দেখিয়ে হাসলাম। আমি যখন রেগে যাই, আমার মনের ভাব লুকোবার চেষ্টা করে বাইরে হাসির ভান করি তাহলে আমাকে কেউ বোকা অথবা বদমেজাজী বলতে পারবে না।

ছাদের পিছন দিকের পাহাড়গুলো নিচু মেঘে ঢেকে যাওয়াতে ধূসর রং-এর ছোপ যেন লেগেছে এখানে সেখানে। আর পূব দিক থেকে লম্বা ছায়াগুলো পড়েছে তার ওপর।

'ঐ পাহাড়গুলোর পেছনে কি দিল্লী?' বানো আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'দিল্লী সমতল ভূমিতে।' আমি উত্তর দিলাম। 'দিল্লী পৌঁছুতে হলে তোমাকে ঐ সব পাহাড়গুলো পেরুতে হবে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বানো আমার দিকে তাকাল। ঠিক আমাদের নিচে আনন্দডেল রেস কোর্স, তারই পিছনে ঐ গভীর খাদ। 'দিল্লী কি তা হলে ঐ খাদের মধ্যে?'

তার এই অবিশ্বাসের উত্তর দেবার চেষ্টা না করে তার দিকে পেছন ফিরে বসলাম।

রাস্তার খুব কাছে মণ্ডপ। মণ্ডপের কিছু পেছনে হানাবাড়ির অতিথি শালা।

বানো যোবানির দানা অতিথি শালার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

বিকেলে সমস্ত সিমলা নিস্তব্ধ ছিল। নিস্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে খোবানি পড়ার শব্দ শোনা যায়। বানো ইশারা করে ওর পেছনে যেতে বলল। অতিথি শালার একটা কাঁচের দরজা ভাঙ্গা ছিল। সে গর্তের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল এবং আমাকে তার সঙ্গে যাবার জন্য বলল।

ঘরটা একেবারে ফাঁকা। দেওয়ালের কাগজগুলো বিবর্ণ। ঘরের মধ্যে একটা দুর্গন্ধময় হাওয়া, মাকড়সার জালে ঘরটা ভর্তি ছিল। মেঝের মাঝখানে একটা ছোট আলোর বৃত্ত ছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল সেটা সাদা থেকে ফিকে হলদে হয় আবার সাদা হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে সাদা আলো পড়েছে যে জায়গাটায় সেটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

'ইংরেজ মহিলা বোধহয় এই ঘরে বাস করতেন।' বানো আস্তে বলল।

'সম্ভবত এই ঘরেই মারা গিয়েছে আমি যোগ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি নিচে নেমে গেল। ধ্বসে পড়া দেওয়ালের পলেস্তরার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে একটা মুখ উঠছে দেখতে পেলাম—মুখটা হাঁ করে আছে। নিষ্প্রভ চোখ দিয়ে আমাকে যেন ঠাট্টা করছে। তার হাসির শব্দও শুনতে পেলাম। কয়েক বছর আগে যে মহিলা আত্মহত্যা করেছে তারই মুখ নাকি ?....তার হাসি সেই রাত্রিতে মায়ের হাসির মতই মনে হল।

'বানো, আমার মায়ের সম্বন্ধে তোমার মা তোমাকে কি বলেছেন ?'

'তা তোমার জেনে কি হবে ?'

বাতাসে পরিত্যক্ত ঘরের দরজা খটাখট শব্দ করে উঠলো।

'বানো, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার কতকগুলো অদ্ভুত ভাবের উদয় হতো। আমি অনুভব করতাম আমি আমার মায়ের মত—আমাদের মধ্যে কতকগুলো ব্যাপারে মিল ছিল। কিছু ছিল যা কেউ কোনদিন বলতে চায় না। আমি বরফের চাদর মুড়ি দেওয়া ভূত দেখেছিলাম, যার হাত দুটো সাদা মার্বেল পাথরের মত এবং সব সময় হাওয়ায় নাচছে। সেই ভূত হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গলা টিপে ধরল—আমি নিজের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলাম। হ্যাঁ, আমার নিজের শরীর থেকে, বানো।'

বানো পাতার মত কাঁপতে লাগল, ভয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

আমাদের জিনিস পত্র বাঁধাছাদা হয়ে গেছে। যাবার জন্যে প্রস্তুত। বাক্স, থলে এবং বিছানায়—'সিমলা-দিল্লীর' লেবেল মারা হয়ে গেছে। তাতে বাবার নাম বড়

বড় অক্ষরে লেখা। চাকররা রয়েছে, তারও পরে বাবার অফিস থেকে পিয়নরা এসেছে। ওরা ছোটা-ছুটি করে জিনিসপত্র তদারকি করছে। সারা বাড়িতেই ব্যস্ততার ভাব।

মা উপরে, তার ঘরে আছেন, করছেন না কিছুই। মায়ের শরীর বোধহয় ভাল নেই। সেজন্য বাবা তার কাছে যেতে বারণ করেছেন।

খুড়ীর বাড়ি থেকে ফেরার পর, আমার সঙ্গে তখনও দেখা হয়নি। রাত্রে আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম, সেই সময় মা ফিরেছেন।

করার কিছুই না থাকাতে, যতক্ষণ না একঘেয়েমি এল, ততক্ষণ বাড়ির মধ্যে ঘুরে সময় কাটালাম। তারপর সবার চোখ এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

ফুটপাতের উপর নেমে, খাদের দিকে চলার সময় রাস্তা থেকে পাইন ফল তুলে দুপকেটে ভর্তি করে ফেললাম। দূরের পাহাড়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো তখনও ঝলমল করছে। মনে হচ্ছে সূর্যটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ার জন্যে অন্ধকারের পথে পাড়ি দিতে সময় নিচ্ছে।

বাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছিলাম এবং যখন ফিরতি পথ ধরলাম, হঠাৎ বীরেন কাকার ছোট বাড়িটা চোখে পড়ল, বেশ নিচুতে নানা গাছপালার মধ্যে সুন্দর ছবির মত দেখাচ্ছিল। আমার মনে পড়ে গেল সেই বিশেষ সন্ধ্যার কথা, যেদিন আমি এবং মা বীরেন কাকার ছোট বাড়িতে এসেছিলাম—যেদিন থেকে মা খুড়ির সঙ্গে থাকতে গিয়েছিল আর বীরেন কাকাও আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

একদিন আমি বীরেন কাকার কথা বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁর মুখের ভাব এত গম্ভীর হয়ে গেল যে আবার জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি। তবু আমি বীরেন কাকার বাড়িতে গেলাম। পশ্চিমদিকে সূর্য ঢলে পড়ার দরুণ ঢালু ছাদটা জ্বল জ্বলে লাল দেখাচ্ছে। ছোট চোরা দরজাটা খোলাই ছিল। পা টিপে টিপে বাগানে গেলাম। বাতাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাসের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবার সময় যেন শোচনীয় কোন দুঃখের সংবাদ দিয়ে যাচ্ছে। বাগানের ধারে পাথরের বেঞ্চিটা দেখতে পাচ্ছি। মা তো ঐখানেই বসেছিলেন।

আমি আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলাম। 'বীরেন কাকা, কাকা।' আমার স্বর নির্জন নির্বাক বাড়ির চারধারে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল। আমার ধারণা হল, স্বরটা বুঝি আমার নয়। কোন অপরিচিতের স্বর আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

'ভেতরে এসো, দরজা খোলা আছে।'

আমি ভেতরে গেলাম। টেবিলের উপর ইতস্তত ছড়ানো বই ও কাগজপত্রের উপর টেবিল-বাতির স্বল্প আলো পড়ছে। বীরেন কাকা তাঁর বিছানার উপর আমাকে বসতে বললেন এবং নিজে আরাম কেদারা টেনে এনে আমার পাশে বসলেন।

'তুমি কি একা হেঁটে এসেছ, এই এতটা পথ?' তাঁর হাতের মধ্যে আমার হাতটা নিয়ে বললেন।

হঠাৎ তাঁর চোখ আমার উপচে পড়া পকেটের দিকে পড়াতে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

'তোমার পকেটে ওসব কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'পাইন ফল?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

'ওসব নিয়ে তুমি কি করবে?'

'ওগুলো দিল্লী নিয়ে যাব।'

'ট্রেনে খাবার জন্যে?' বীরেন কাকার মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল।

'হ্যাঁ কাকা। আমরা আজ রাত্রেই দিল্লী যাচ্ছি।'

তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, আমার দিকে নজর না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দমবন্ধ করা স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ করতে থাকল। আমার ধারণা হল, আমরা যে আজ চলে যাচ্ছি তা তার অজানা নয়, যখন তিনি জানালার ধার থেকে সরে এলেন, তার নীল চোখ জ্বলে উঠল।

'তোমার কি মনে আছে সেদিন যে ফটোটা তুলেছিলে?' তিনি জিজ্ঞাসা করে আবার বললেন, 'সেটা তৈরী হয়ে গেছে। তুমি কি দেখতে চাও?'

আলমারি থেকে একটা খাম বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার হাত বেশ তৈরী। তিনি বললেন, 'ছবিটা সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে।'

ছবিটার দিকে তাকালাম। যে ঘটনাটি আমার বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছিল সেটা আবার পরিষ্কার মনে পড়ল।

পিছনে আবছা পাহাড়, বীরেন কাকা বারান্দার বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে অজানিত ভাবে মায়ের শাড়ি ছুঁয়ে আছেন। মা....আধ-বোজা চোখে দাঁড়িয়ে। দুটি ঠোঁট খোলা, মনে হচ্ছে তিনি হয়ত কিছু বলতে চাইছিলেন কিছু ভেবে নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন।

তারপর আমার আজকের ট্রেন-যাত্রার কথা মনে পড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে কাকা....' এত অভিভূত হয়ে পড়লাম যে মনের

কথা বলতে পারলাম না।

বীরেন কাকা আমার কাছে এল। সেই রাত্রিতে মা যেভাবে আমাকে চুমু খেয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই বীরেন কাকা আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে কপালে চুমু খেলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম।

আমি কি রাস্তা অবধি পৌছে দেব? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি মাথা নাড়লাম। পথ আমার জানা আছে। অল্প সময়ের জন্য বারান্দাতে আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'খোকা'....চমকে তাঁর দিকে তাকালাম।

'তোমার মা একসময় একটা বই চেয়েছিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম....'

তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

'দয়া করে আমাকে দিন। সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

বইটা আমাকে দেবার সময় মনে হল তিনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।

তাঁর বাড়ি পিছনে পড়ে রইল। নির্জন রাস্তা দিয়ে, বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ির কাছে এসে রাস্তার বাতির আলোয় বইটাকে পরীক্ষা করবার জন্যে দাঁড়ালাম।

ছবির থাম বইটার পাতার মাঝে ছিল।

বইটা খুব পুরানো। এমনকি আজও আমি পরিষ্কার বইটাকে স্মরণ করতে পারি। বইটা হলদে এবং পাতাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছিল—নাম, ফ্লাউবার্টস্ লেটার টু জর্জ স্যাণ্ড। সে সময় আমি এই ফ্লাউবার্টস কিংবা স্যাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। বেশ কয়েক বছর বাদে যখন আমি এই বই পড়েছিলাম, মা তখন আর ইহ জগতে নেই এবং বীরেন কাকা এদেশ ত্যাগ করে ইটালিতে গিয়ে বাস করছেন।

কিন্তু সেইদিন বইটার সম্পর্কে আমার মনে বিশেষ কোন ঔৎসুক্য জাগেনি। হাতের মধ্যে বইটাকে ধরে, উপরের ঘরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ আমি রাস্তার বাতির নিচে দাঁড়িয়েছিলাম।

মায়ের ঘরের জানালা বন্ধ ছিল কিন্তু একটা অশরীরি আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল। সেই দিনই আমাদের সিমলায় শেষ সন্ধ্যা কাটল।

গোলাপের পাপড়ি

ঊষা প্রিয়ংবদা

সুবোধ একটু সন্ধ্যে করে বাড়ি ফিরল। বাড়ির দরজা হাট করে খোলা, বারান্দাতে অল্প আলো এসে পড়েছে এবং রান্নাঘরের উনুনে আগুন জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই তার মনে হল, ঘর থেকে কোন জিনিস খোয়া গিয়েছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় ঘরটা ন্যাড়া দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ঘরের কার্পেট এবং একটা ছোট টেবিল সরে গিয়েছে। কৃত্রিম ফুলে সাজানো ফুলদানিটা টেবিলের উপর ছিল, সেটা এখন জানালার কাঠের উপর পরিত্যক্ত অবস্থায় হেলে পড়ে আছে।

সে খুব সন্তর্পণে ফুলদানিটা তুলল। কাগজের ফুল সুন্দর কাট্-গ্লাসের ফুলদানিতে রাখা ছিল।' বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শোভা বাগান থেকে আসল গোলাপ ফুল নিয়ে এসে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখত। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বিবর্ণ ফুলগুলি তার চোখের সামনে পড়ে আছে। শোভা এখন অপরের বাগ্‌দত্তা এবং তার ভাবী স্বামী ভালো চাকরি করে। সুবোধ অন্যমনস্ক ভাবে পেরেকে কোট টাঙিয়ে রাখল। কতদিন আর শোভার বাবা তার জন্য শোভার বিয়ে পিছিয়ে দিতে পারেন? সে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল ধুলোয় ভরা সন্ধ্যা কুয়াশায় ভরে গিয়েছে। কর্মক্লান্ত মুখ এবং অবশ মন নিয়ে সুবোধ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মা উনুনের পাশে বসে ছিলেন। সে একটা ছোট্ট ফুল টেনে নিয়ে তাঁর পাশে বসল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কেউ কোন কথা বলল না। কেবলমাত্র মাঝে মধ্যে মা তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি যেন পাথর থেকে খোদাই করা প্রাণহীন মূর্তি—কেবলমাত্র চোখদুটি জীবন্ত।

'মা, আমার কার্পেটের কী হল?'—সুবোধ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, সেটা কি রোদ্দুরে দেবার জন্য বার করেছ?'

'বৃন্দা তার ঘরে কার্পেটটা নিয়ে গিয়েছে'। তার মা বলল। তারপর শাড়ির আঁচলে মাথা ঢেকে বলল যে, সে তার কয়েক জন বন্ধুকে রাত্রে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে।'

সুবোধ নিজের সারল্যের জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিল। তার এসব ভালো করেই জানা আছে। বেশির ভাগ জিনিসই এখন বৃন্দার ঘরে গিয়ে জমা হয়েছে।

প্রথমে পড়ার টেবিল, তারপর ঘড়ি, ইজিচেয়ার এবং এখন কার্পেট, তার সঙ্গে একটা ছোট টেবিল। প্রথম দিকে আসবাবপত্রের স্থানান্তর ঘটলে সে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা সহ্য হয়ে গেল। তবু মেয়েদের আধিপত্যে পুরুষদের মনে বিরক্তির উদয় হয় বৈকি!

তাকে উত্তেজিত দেখে মা বললেন, 'তুমি আমাকে চায়ের জন্য বসিয়ে রেখেছ? আমি এখনই কিছু তৈরী করব। আবার চলে যেও না।'

সুবোধ দুহাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে বসে রইল। মুখের রেখাগুলো ক্রমশ গভীর হল। উদাস চোখে সে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বটে কিন্তু মনটা নিঃশব্দে নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। মার কী করে ইচ্ছে হয় সুবোধ আবার ছেলেমানুষ হোক এবং তিনি একবার স্নেহের পরশকাঠি বুলিয়েই তার সব ব্যথা দূর করতে পারবেন। কিন্তু আজকের সুবোধ, মার সামনের অপরিচিতের মত বসে রইল। ওর কোন সমাজ নেই, শুধু দুরন্ত খেয়ালে সারাটা দিন চাকরির ধান্দায় ঘুরে কেবলমাত্র রাত্রে শোবার জন্য বাড়ি ফিরত। শোভার বিয়ে যত কাছে এগিয়ে আসছে ততই তাব মনের ভিতরটা পরিবর্তিত হচ্ছে।

ওর দুচোখ ভরে জল এসে গেল। মার বিষাদপূর্ণ চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল! সুবোধ মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, জল ফুটছে।

হঠাৎ তাঁর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যাওয়াতে মা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। তিনি উঠে তাক থেকে চায়ের কৌটা পেড়ে জলে চা ছড়িয়ে টি-পটটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলেন। বৃন্দা টি-পটের ঢাকনাটা তৈরী করেছিল এই আশায় সে বিয়ের সময় তত্ত্ব হিসাবে ওটা পায়। মা খুব যত্ন করে ওটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। এটাকে দেখে তার পরাজয়ের প্রতীক বলে মনে হয় এবং তার চেয়ে বেশি অপরাধী বলে সুবোধের নিজেকে মনে হয়, কারণ সে ছোট বোনের বিয়ে আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি।

টি-পটের ঢাকনাতে একটা গোলাপ ফুল সেলাই করা ছিল। সুবোধের হঠাৎ শোভার কথা মনে পড়ে গেল। কারণ সে প্রায়ই গোলাপ ফুল আনত।

তার মা দুধ গরম করে কাপগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে চায়ের সরঞ্জাম সুবোধের দিকে এগিয়ে দিল। সুবোধ পা দুটো কোণাকুনি রেখে চা ঢেলে ফেলল।

মা ভাঁড়ার ঘরের দিকে গেলেন এবং তাঁর কোন কিছু ওলট পালট করার শব্দ পেল শুনতে। কিছুক্ষণের মধ্যে রাংতায় মোড়া আপেলের জ্যাম নিয়ে ফিরে বললেন, 'তোমার জন্যে একটা ভালো জিনিস আছে।'

বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়ে সুবোধ খুশী হবার মত বলল। 'মা, ব্যাপারটা কী?

কোন অনুষ্ঠান করছ না কি ?'

'তুমি কোনদিন ঠিক সময়ে ফের না।' আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে মা আবার বললেন, 'তুমি রাত্রে এগারোটার আগে খাওনা, তখন খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সকালে অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠো এবং দুপুরে তোমার কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ অনেক দিনই পাই নি।'

অতীতেও সুবোধ অনিয়মিত জীবন যাপন করত। তখনকার অবস্থা অন্য রকম ছিল। বৃন্দা এবং মা তার জন্যে অপেক্ষা করত এবং যতক্ষণ না সে খেয়ে উঠত ততক্ষণ তারা খেত না। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, লক্ষ্য রেখে তারা নানা রকম ব্যবস্থা করত। এখন সকাল সাড়ে আটটার সময় সে বিছানা ছেড়ে ওঠে ; তখন অর্ধেকের উপর রান্না শেষ হয়ে যায়। বৃন্দার সকালের ভাত খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও সে সকালে চায়ের জন্য সব সময় প্রস্তুত হতে পারে না। আগে বৃন্দা সুবোধের খবরের কাগজ না পড়া পর্যন্ত ওতে হাত দিতে সাহস করত না কারণ সে প্রায়ই পাতা ওলটপালট করে ফেলত। কিন্তু এখন সুবোধকেই বৃন্দার ঘর থেকে কাগজ নিয়ে আসতে হয় এবং সেই কারণে বাড়িতে কাগজ পড়া সে ছেড়ে দিয়েছে।

মা চায়ের সরঞ্জাম এক জায়গায় রাখলেন এবং তার দিকে চেয়ে কিছু বলবেন বলে ইতস্তত করতে লাগলেন। 'কী, কিছু বলবে ?'

মা কাপ ডিস ধুতে ধুতে মাথা তুলে বললেন, 'ঘরে আনাজপত্র কিছু নেই। তারপর শাড়ির আঁচলের গেরো খুলে একটা কোঁচকানো এক টাকার নোট দিলেন। 'একটু তাড়াতাড়ি করিস। আমাকে অনেক কিছু রাঁধতে হবে।

সুবোধ কোট না পরে থলে হাতে নিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়ল। সে বহুদিন ধরে একই পায়জামা পরছে সুতরাং কে কী তার সম্পর্কে ভাবছে কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। যখন সব্জিওলা তার থলেতে কাদা মাখানো আলু ভরে দিচ্ছিল, হঠাৎ একজন তার ঘাড়ে এসে পড়ল। দেখল সব্জি কিনছে কোন এক বাড়ির নেপালী চাকর। চুল দিয়ে তার তেল গড়াচ্ছে এবং কিছু চুল তার কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে। সে বিড়ি টেনে অত্যন্ত একটা বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুবোধ হাতে একটা থলে নিয়ে এসেছে। কী অধঃপতন! সুবোধ নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখল, তারপর রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কারণ তার অবস্থা ঐ বাড়ির চাকরদের চেয়ে কোন মতেই ভালো নয়।

অথচ, এইতো কিছুদিন আগের কথা, সে তখন ভালো চাকরিই করতো। তবু সহ্য হল না মালিকের অপমানসূচক কথাবার্তা। অতবড় চাকরিটা ছেড়ে দিল শুধু

আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে। হ্যাঁ, আত্মসম্মানবোধটা সুবোধের একটু বেশি মাত্রায় ছিল। আর আজ? সেই আত্মসম্মান-সম্ভ্রম তাকে শেষপর্যন্ত কোন মূল্য দিল? সে এখন তার ছোট বোন বৃন্দার সংসারে একটা বোঝা। ওর এই দুরবস্থায় মা পর্যন্ত দারুণ অসন্তুষ্ট। জীবন তার কাছে একদিন রঙিন পতাকা তুলে ধরেছিল, কিন্তু সে তো নিজেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।....শোভা যে তাকে ভালবাসতো আজ সেও বোধ হয় তার দশা দেখে দূরে সরে গেছে।....

সব্‌জিওয়ালাকে পয়সা মিটিয়ে সুবোধ বাড়ির দিকে রওনা হল। লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে বেঁচে থাকা তার পক্ষে খুবই কষ্টকর, তবু চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে যে ঠিক কাজ করেছে সেটা ভেবে মনে মনে সে গভীর তৃপ্তি পায়। মাঝে মাঝে সে ভাবে, আত্মসম্মান কথাটা ইদানিং কত ঠুনকো হয়ে গেছে।....আত্মসম্মান! ....কথাটা যেই মনে পড়ল অমনি একটা তিক্ত হাসি তার ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠল। অতীতের অনেক ঘটনাই তো মনে মনে ভেসে ওঠে ওই কথাটার সূত্রে—মনকে চাবুক মেরে নাড়া দিয়ে যায়। তার স্মৃতির মণিকোঠায় সব জমা আছে। প্রত্যেকটা ঘটনা সে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পায়।

চাকরি ছাড়ার পর আবার নতুন চাকরির সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছিল। কয়েকমাস পরে যখন সে ফিরল তখনও বেকার। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল এর মধ্যেই তার সমস্ত জিনিসপত্র ওলটপালট হয়ে গেছে। বৃন্দা তার ঘরের অনেক জিনিস দাবী করে বসল, এমন কি পড়ার টেবিলটা পর্যন্ত।

'দাদা, টেবিলটা নিয়ে তুমি আর কি করবে?' সে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই বলেছিল, 'আমার প্রয়োজন তোমার চেয়ে বেশি।'

সে কি টেবিলটা দাবী করতে পারত, একমাত্র কারণ হল বেশ কয়েক বছর পরিশ্রম করে বার কয়েকের চেষ্টায় কিছুদিন আগে বি. এ. পাস করেছে এব 'শিক্ষা' বিষয়ে ডিপ্লোমা নিয়েছে। কোন লোক শুধুমাত্র শিক্ষকতা করলেই কি বই পড়তে ভালোবাসে? সুবোধ ভাবল।

এখন সেই টেবিলে বৃন্দার কয়েক শিশি নখের রং, চুলের কাঁটা এবং ধুলোপড়া খান কয়েক সস্তা উপন্যাস এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকে। কিছুদিন পরে মা বলেছিলেন, 'বৃন্দার রোজ স্কুলে যেতে দেরি হয়। সুবোধ, তুই বরঞ্চ তোর এলার্ম ঘড়িটা দিয়ে দে।'

'কেন, সে একটা নতুন কিনতে পারে না? সুবোধ একটু কঠোর হয়ে বলল, 'তার তো প্রচুর টাকা আছে।'

মা তিরস্কারের ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'টাকা কোথায়? তুমি যদি

জানতে কত কষ্ট করে ও এই সংসার চালাচ্ছে!'

'বৃন্দার চাকরি পাওয়ার আগে কে এই সংসার চালাতো? নিশ্চয় আমি। সংসার চালাবার ব্যাপারে কী বা জানি? আমি বেকার, বাড়িতে বসে বসে খাচ্ছি।' সুবোধ তিক্তস্বরে বলল।

হঠাৎ রেগে উঠে সে ঘড়িটা মাকে দিয়ে দিল। বৃন্দার মনোভাব দেখে সে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এই মেয়ে এক সময় অতি সাধারণ জিনিসের জন্য তার কাছে আব্দার করত। আর এখন, একদিন সে যখন বেশ রাত্রি করে বাড়ি ফিরেছিল তখন শুনতে পেয়েছিল বৃন্দা মাকে বলছে, 'তার এখন এত কী কাজ? তোমার সম্পর্কে কোন বিবেচনা নেই? এই ঠাণ্ডায় তুমি কতক্ষণ তার জন্যে বসে অপেক্ষা করবে? তার চেয়ে খাবার কোথাও বেড়ে রেখে দাও। তার যখন ইচ্ছে হবে তখন খেয়ে নেবে।'

এই ঘটনার পর সুবোধ চুপি চুপি চোরের মত বাড়িতে ঢুকে নিজেই ঠাণ্ডা খাবার নিয়ে খেয়ে নেয় এবং সোজা তার ঘরে চলে যায়। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙলেও বিছানায় শুয়ে থাকে এবং বৃন্দা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে সকালের চা খাবার জন্য মার কাছে যায়। চা খেয়ে তার কাজ হল বাজারে যাওয়া। বাজার করে যখন সে ফিরল তখন দেখল মা তার জন্যে দরজার ধারে অপেক্ষা করছেন। মার হাতে সবজির থলি দিয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল। জুতো খুলে তার জীর্ণ দড়ির চারপাই-এ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। দড়ি তার ভারে নিচু হয়ে গেছে এবং বালিশটা পড়ে গেছে। দড়ির ভাঁজ তার পিঠে কাঁটার মত ফোটে। চোখ বন্ধ করে সে টান টান হয়ে শুয়ে রইল এবং শুয়ে শুনছিল। নানারকম শব্দ তার কানে ভেসে আসতে লাগল। কতকগুলি বাচ্চা জানালার পেছনে দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে। কেউ পুরোনো বাঁশির গৎ বাজাচ্ছে। ভারি জুতোর ধপ্ ধপ্ শব্দ, ডিসের খটাখট, সব্জি ভাজার হিস্‌হিস্ আর দরজার দিকে কারো বিছানা টেনে নিয়ে যাবার খড়্‌খড়্ শব্দ কানে আসছিল।

সামনের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। পরক্ষণেই বৃন্দার তীক্ষ্ণ স্বর সে শুনতে পেল, 'মা, দাদা কি আছে?'

সুবোধ নড়াচড়া করল না। বৃন্দা দরজার সামনে এসে বলল, 'দাদা, টাকাটা নিয়ে টাঙ্গাওলাকে ভাড়াটা দিয়ে এসো তো।'

সুবোধ জুতোটা পায়ে গলিয়ে টাকাটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই শোভার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য তার শুভেচ্ছা গ্রহণ করতে হল। তারপর টাঙ্গাওলাকে ভাড়া দিয়ে সে প্রতিবেশীর

বাড়িতে সরে পড়ল। সেখানে দাবা খেলা হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে দাবা খেলা দেখতে লাগল।

যখন বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল তখন রাস্তা মরুভূমির মত ফাঁকা হয়ে গেছে। বাড়ির অল্প আলোয় রাস্তাটা আলো-আঁধারি হয়ে আছে। অবশ্য হঠাৎ খদ্দেরদের অপেক্ষায় পানের দোকানী তখনও বসে ঝিমোচ্ছে।

'দাদা, কোথায় ছিলে?' বৃন্দা চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'শোভা আর তার বন্ধু নির্মলা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।'

'আমি ওসব জানি না।' সুবোধ শান্ত স্বরে বলল।

'মনে হচ্ছে শোভাকে এর আগে কোনদিন পৌঁছে দিয়ে আসো নি।'

হ্যাঁ, সে আগেও তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। মনে মনে সুবোধ চিন্তা করল। কিন্তু এখন সেটা অতীতের ঘটনা। তখন শোভা অন্য কারুর কাছে বাগ্‌দত্তা হয়নি এবং সেও বেকার ছিল না। শোভা তাকে দেখে লজ্জা পেত তবুও বাড়িতে এসে ফুলদানিতে গোলাপ ফুল সাজিয়ে রাখত। মা তার জন্যে একটা সোনার গহনা গড়িয়ে রেখেছিল এবং বৃন্দা তার ঘরে বসেই গুম হয়ে চিন্তা করত। কারণ সে তার কুৎসিত রূপের জন্য স্বামী পাচ্ছে না।

'চল যাওয়া যাক।' শোভার চোখ এড়িয়ে সুবোধ বলল।

'তাড়াতাড়ির কিছু নেই। আগে তুমি খেয়ে নাও।' শোভা বলল।

মা আগুনের উপর একটা পাত্র বসিয়ে এলেন। সুবোধ খেতে বসে পড়ল এবং শোভা তার সামনে একটা টুল রেখে গেল। শোভা শাড়ির আঁচল ভালো করে জড়িয়ে থালায় প্রচুর খাবার নিয়ে এল। চোখ নিচু দিকে করে সে খাওয়া শুরু করল। রান্নাঘর এবং বারান্দায় চলাফেরা করার সময় শোভার শাড়ির আনাগোনা তার চোখে বার বার ভেসে উঠছিল। সবুজ খোল, কমলালেবু রং-এর পাড় এবং সারা গায়ে তোতা পাখির ছাপ মারা শাড়িটা পরে চোখের সামনে শোভা ঘুরছে। কখনও তার নরম ফর্সা পায়ের কবজির উপর অবধি সে দেখতে পাচ্ছে। সুবোধের মনে হল যেন সে অতীতের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। সে চাকরি করছে আর শোভা কেমন সবার অগোচরে তাকে ভালবেসে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে আত্মসচেতন হয়ে গেল। সম্ভবত সুবোধের কাছে বিয়ের ব্যাপারে ওর বাবা যে কথা বলেছে সেই কথাটা স্মরণ করে সে সাবধান হতে চাইল। তাদের এত দিনে বিয়ে হয়ে যেত যদি সুবোধ ইতিমধ্যে একটা নতুন চাকরি জোগাড় করে নিত কিংবা পুরোনো চাকরিতে বহাল থাকত।

তার খাওয়া শেষ হবার পর যখন হাত ধোবার জল শোভা ঢেলে দিচ্ছিল তখন তার চুলের ভুরভুরে গন্ধে সুবোধ একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল আর শোভার শান্ত বিষাদমগ্ন চোখ দুটি দেখতে পেল।

সে টাঙ্গা নিয়ে ফিরে এসে দেখল শোভা মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মা তার চুলে নরম হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

রাস্তায় তারা পরস্পরের সঙ্গে কোন কথা বলল না। প্রথমে নির্মলার বাড়ি পড়াতে সে নেমে গেল।

'তুমি এখানে এসে একটু বসবে? কোই এস।' শোভা ভীরু কণ্ঠে বলল। সুবোধ তার দিকে তাকিয়ে নীরবে পিছনে এসে তার পাশে বসল।

'কিছু বল।' শোভার গলায় সানুনয় প্রার্থনা।

'আমি কি বলব?' সুবোধ তার দিকে তাকিয়ে বলল।

শোভার চোখে জল। 'আমি বাবাকে অনেকবার বলেছি কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।' সে চোখের জল মুছে অনেক কষ্টে বলল।

'আমি তো তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না।' সুবোধ উদাসভাবে বলল। 'দোষ আমারই। আমি জীবনযুদ্ধে হেরে গেছি, একেবারে হারিয়ে গেছি। আমি জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌছেছি। আমার জীবনে আর কোন কিছুর পরিবর্তন হবে না। তোমার বাবা ভালোই করেছেন। তোমার ভালোর জন্যই সব কিছু করেছেন। পেটের খিদে ভালবাসার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পেটের দাবী সকলের উপরে। তার আগুন সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, শোভা।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর?'

'জীবনই আমাকে এসব শিখিয়েছে।'

শোভা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেন বলে উঠল, 'সুবোধ, দেখছ! এই টাঙ্গাওয়ালা, আমরা বাড়ি পেরিয়ে চলে এসেছি। দয়া করে আবার পিছিয়ে চল।'

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সুবোধ দেখল বারান্দায় ধোপা বসে আছে। যতক্ষণ না চা তৈরী হচ্ছে, ততক্ষণ সুবোধ তার ময়লা জামা কাপড় জড়ো করে একটা স্তূপ করে ফেলল। আলমারিতে তার একটি মাত্র পরিষ্কার সার্ট আছে, সেই জামার পিঠের দিকটা ছিঁড়ে গিয়েছে। সে তার উপর কোট পরে সেটা লুকিয়ে রাখল। সে কোটটাকে কাচতে দেবে কিনা চিন্তা করছিল। পরে ভাবল থাক, যতদিন না ধোপা অন্য কাপড়গুলো পরিষ্কার করে ফেরত দিয়ে যাচ্ছে

ততদিন তার যেভাবে চলছে সেই ভাবেই চলুক।

এক কাপ চা গিলে সে বাইরে বেরিয়ে এল। পকেট হাতড়িয়ে তার হাতে যে কটা পয়সা উঠল তাই দিয়ে পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনল। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার বাড়ির দিকে রওনা হল। রাস্তায় তার সঙ্গে ধোপার দেখা হয়ে গেল। ধোপা তাকে দ্বিতীয়বার সেলাম দিল।

'দেখ, তুমি ঠিক সময়ে এস, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বাবু ঠিক সময়েই কাপড় দিয়ে যাব!' ধোপা চলে গেল।

ঘরে ঢুকেই সুবোধ অবাক। সে যে রকমভাবে তার কাপড় জামা রেখে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই সব পড়ে আছে মেঝেতে।

'মা, আমার জামা কাপড় কাচতে দেওয়া হল না কেন?' যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে থেকে চিৎকার করে সুবোধ বলল।

'আমি জানি না, বাবা।' মা উত্তর দিল, 'বৃন্দা ধোপাকে কাপড়জামা বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি তো তোমার কাপড়ের কথা তাকে বলেছিলাম........'

সুবোধ রাগে ফেটে পড়ে বলল, 'তুমি জান, আমি কতদিন ধরে এই একই জামাকাপড় চালাচ্ছি।' সে ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, 'পনের দিন পরে ধোপা এল, আর তোমরা আমার সম্মানের সামান্য মুল্যও দিলে না! তোমরা দুজন, মা ও মেয়ে, আমার কাছে কি চাও? আমি বেকার বলে তোমরা আমাকে চাকর ছাড়া আর কিছুই কি ভাবতে পারো না? বাকি জীবনটা তাহলে আমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেই কাটাতে হবে?'

সুবোধের গলা এত উঁচু পর্দায় উঠল যে বাইরে থেকেও তার কথা শোনা যেতে লাগল। মা নিরুপায় হয়ে কাঁদতে লাগলেন? তিনি কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলেন কিন্তু সুবোধ তাকে কোন সুযোগ দিল না। সে বলতে লাগল, 'তোমরা আমাকে বিনা মাইনের চাকর পেয়েছ? আমার অবস্থাটা হয়েছে ঠিক তাই। তোমাদের কি কোন দিন আমি কোন কাজের ভার জোর করে চাপিয়ে দিয়েছি?' মায়ের গলার স্বর অনুকরণ করে বলল, 'বাড়িতে কোন সব্‌জি নেই, তুমি বাজারে যাও। বৃন্দার বন্ধুরা রাত্রে বাড়িতে খাবে।' তারপর গলার স্বর পালটে বলতে লাগল, 'আর দেখ, আমার আদর্শ ভগ্নী বৃন্দাকে! তিনি শুধু একমাত্র জানেন কি করে আমার ঘাড়ে কাজের ভার চাপানো যায়। এখন আমি জানি, আমি এ বাড়িতে কতটুকু সম্মান পাই। আমি চলে যাবো। তখন তোমরা শান্তিতে এই বাড়িতে থাকতে পারবে—তোমরা দুজনে মা আর মেয়ে।'

সুবোধ রাগে যেন জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ছেড়ে গেল। একটা দানবীয় আবেগ

যেন তাকে গ্রাস করল। তার সামনের সব কিছু ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে হল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চলার সময় একটা সাইকেলে ধাক্কা খেল সে। সাইকেল এবং তার চালক দুজনেই তার ঘাড়ে পড়ল। সাইকেলের ধাক্কায় সে খোয়ার রাস্তায় পড়ে গেল আর কনুইতে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলো। কি যে হল সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। সুবোধ বোকার মত মুখ করে উঠে দাঁড়াল। 'আরে ভাই, ভালো করে দেখে তবে তো পথ হাঁটবে। আমার মনে, হয় খুব বেশি চোট লাগেনি।' এই বলে আরোহী নিজের জামাকাপড় থেকে ধুলো পরিষ্কার করে রাস্তা থেকে সাইকেল তুলে নিল।

যদি সুবোধের সঙ্গে তার মারামারি হত তাহলে আহত অবস্থায় সে অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু সাইকেল আরোহীর ভদ্রতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

'যখন সুবোধ হাঁটতে চেষ্টা করল তখন সে বুঝতে পারল তার বাঁ পা ফুলতে আরম্ভ করেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। তার ডান কনুই দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল এবং ব্যথাও আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। সে সাবধানে পাটা তুলে বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল। সেই বেঞ্চির কাছে ঘন ফ্যাকাশে গোলাপের ঝোপ ছিল। ব্যথা ভোলার জন্য সে ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকল। যখন ব্যথা কম মনে হল তখন সে সকালের ঘটনা রোমন্থন করতে শুরু করল।

শীতের সকাল কিন্তু বেঞ্চি আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠতে লাগল এবং তার পিঠের ব্যথাটা বেশ চাড়া দিয়ে উঠল। সে চোখ বন্ধ করে নিশ্চল ভাবে শুয়ে রইল। যখন পায়ের ব্যথা কমে গেল তখন কনুই এর ব্যথা হঠাৎ বেড়ে উঠল। মনের কষ্টের সঙ্গে ব্যথাটার বোধহয় যোগাযোগ ছিল।

তার খেয়াল ছিল না কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখে সূর্য ঠিক মাথার উপরে এবং বেঞ্চি গরম হয়ে গেছে। বাঁ পাটা টেনে টেনে একটা ছায়া দেখে সে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। একটা অস্পষ্ট অসাড়তা তার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছিল। শুলেই বোঝা যায় বিছানাটা বেশ ঠাণ্ডা। কোথায় যেন গোলাপ ফুটেছে। বাতাসে ভেসে আসছে তার মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু নানা রকম উদ্ভট চিন্তায় মনটা তার ভরে রয়েছে।

হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ল। মা হয়ত এখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘোর দুশ্চিন্তা নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সারাদিন সে কিছু খায় নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুবোধ আবার মাথার তলায় হাতদুটো রেখে চোখ বুজলো।

দিনটা যেন চলে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, শেষে হতে আর চায় না। এমনি অনেকক্ষণ পরে সুবোধের মনে হল একটা তারা যেন আকাশে দেখা গেল। তার

পর আরও কয়েকটি চোখে পড়ল। সুবোধ ঘাসে ঢাকা জমি থেকে উঠে আবার বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথাটা তার খুব ভারি মনে হল। মুখটা বিস্বাদ এবং পাটা এত ভারি মনে হল কেউ যেন ভারি পাথর তার পায়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। সারাটা দিন চলে গেল কিন্তু তাকে খোঁজ করতে কেউ এল না। সুবোধ ভাবল বৃন্দা অন্তত জানে, প্রায়ই সে পার্কে এসে বসে। কিন্তু তার না ফেরায় বৃন্দার মাথাব্যথার কোন কারণ তো থাকতে পারে না।

পার্কের লোকজন একে একে চলে যেতে শুরু করল। প্রথমে বাচ্চারা আয়াদের সঙ্গে চলে গেল। তারপর শরীর সুস্থ রাখার তাগিদে যেসব বুড়োরা এসেছিল তারাও চলে গেল। এবং সব শেষে গেল খারাপ পাড়ার ছিনাল মেয়েরা....। সারাদিনে হৈ-চৈ-এর পর পার্কে আস্তে আস্তে নিস্তব্ধতা নেমে এল। চিনে বাদামের খোসা, নোংরা ছেঁড়া কাগজ, গোলাপ ফুলের ঝরে যাওয়া পাপড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ছোটখাট জিনিসগুলো একে একে সুবোধের নজরে পড়তে লাগল!

পার্কের তিনটে দরজা বন্ধ করে মালি সুবোধের বেঞ্চির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও মশাই, বাড়ি যান। পার্কের গেট বন্ধ করবার সময় হয়ে গেছে যে।'

সুবোধ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। সে টলমল করে কয়েক পা গেল, তারপর কয়েক পা সাধারণভাবে জোরে হাঁটার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁ পাটা খুব ভারি হওয়াতে সে যন্ত্রণাতে কঁকিয়ে উঠল। সে পার্কের বাইরে এসে দাঁড়াল।

দরজা খোলা ছিল। বারান্দাটা অল্প আলোয় দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু রান্নাঘর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। জড়ো করা ময়লা জামা কাপড় একই জায়গায় পড়ে আছে। একই আলগা দড়ির চারপাই, একই নোংরা বিছানার চাদর। কাপড় জামা চাপা দেওয়া চায়ের টেবিলের উপর খাবার।

সে চারপাই-এর উপর বসে পড়ে গোগ্রাসে খাবারগুলো মুখের ভেতরে ঠেলে দিয়ে গিলে ফেলতে লাগল!

এই রাত সেই রাত

অমৃত রায়

—বাবু তিনটে পোষ্টকার্ড আর একটা খাম দিন।

—মাষ্টার মশায়, এক আনাওয়ালা একটা টিকিট।

—হুজুর, একটা মনিঅর্ডার করবো।

—এই যে, নিউজিল্যাণ্ডের খামে কত দামের টিকিট লাগাতে হবে বলুন তো?

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, টাকা আজকে না তুললে ফ্যাসাদে পড়ব।

—একটু যদি কয়া করে....

—বাবু এটাকে একটু ওজন করে বলুন তো, কত দামের টিকিট লাগাতে হবে।

কাউণ্টারের ঐ পাশে প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন নতুন লোকের আনাগোনা লেগেই আছে। আলমারি, চেয়ার, টেবিল, দাঁড়িপাল্লা, ছোট টিনের কৌটোতে আগুন ধরানোর ব্যবস্থা। শীলমোহর, দড়ি, কাঁচি, খাতা, পেন্সিল, নানাধরণের জিনিসে ঠাসা হয়ে আছে ঐ ডাক ঘর। দোর গোড়ায় অনেকগুলো নোটিশ টাঙ্গানো রয়েছে। এই ডাক ঘরের দুনিয়াতেই চন্দ্রিকাবাবু গত দশ বছর ধরে কাজ করছে। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, মাথা তোলার ফুরসৎ পায় না। ডাক ঘরের বাইরে আশে পাশে কোথাও সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। যে দিকেই তাকাক সব বাদামী। সবুজের দিকে তাকানোর ইচ্ছা পূরণ করতে হলে তাকে ডাক ঘরের অদূরে নিম এবং তেঁতুল গাছের দিকে তাকাতে হত। সেই দুটো গাছকে ঘিরে কিছু ঘাসও গজিয়েছে।

কিন্তু এই এক পেশে বিরক্তিকর কাজের মধ্যেও মানুষ একটু বৈচিত্র্য খোঁজে। পাথুরে জায়গাতেও তো ফুল-না-ফোটা গাছকে পাঁজর ফাটিয়ে হাসতে দেখা যায়।

হালকা ফলের রঙের রেশমী শাড়ি পরা এক বউ কাউণ্টার থেকে সরার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিকা নিজের সহকর্মী এক বাঙ্গালী বাবুকে বলে, 'মধুময়, দেখলে ঐ মেম-সাহেবকে?'

মধুময় রায় বলে, 'মিসেস ব্যানার্জীর কথা বলছ? দেখেছি! ওর স্বামী আর্মিতে কাজ করে। ব্যারিষ্টার আশু ব্যানার্জী ওর শ্বশুর।

তক্ষুণি কে যেন পয়সা এগিয়ে ধরে চারটে টিকিট চায়। চন্দ্রিকা তাকে

টিকিট দিতে দিতে বলে, 'তুমিতো দাদা ওর সম্পর্কে সব কিছু জান দেখছি। আচ্ছা তুমিই বল দেখি, বউটি বেশ মনে দোলা দেওয়ার মত চিজ্ না? গত পাঁচ বছর ধরে লক্ষ্য করছি, ঐ এক আছে। স্বাস্থ্যে একটুও ভাঙ্গন ধরেনি। আচ্ছা তুমিই বল দেখি মধুময় ওর বয়স কত হবে?'

মধুময় হেসে বলে, 'শোন চন্দ্রিকা। ওসব ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না। পাগল হয়ে যাবে। খেপলে নাকি, এই আধুনিকাদের বয়স জানতে চাইছ? এদেরতো এক বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বছর বয়স কমে যায়। স্নো, পাউডার, আর পোশাকের মুখোশ সরিয়ে তাদের আসল রূপ ধরাটা সহজ নয়।'

মধুময়ের কাকা দিল্লীতে থাকে। দিন কয়েক হল সে নিজেও দিল্লী ঘুরে এসেছে। তার খুব ইচ্ছা করল দিল্লীর হাল চাল কিছু চন্দ্রিকাকেও বলে। নিজের কথার জের টেনে বলে, 'তুমি কখনও দিল্লী গেছলে চন্দ্রিকা, যাওনি তো?' তাই অমন অবাক হয়ে বলছ। একবার দিল্লী ঘুরে এস চোখ খুলে যাবে। সন্ধ্যার সময় একবার শুধু গিয়ে কনট প্লেসে দাঁড়িয়ে পড়। কত রকমারী সুন্দরীকে দেখতে পাবে। কেমন সুন্দর অাঁট সাঁট পোশাক পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত দেখতে কি বাহার। কত বিচিত্র ধরনের ভ্যানিটি ব্যাগ....সন্ধ্যা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব অপ্সরা স্বর্গ থেকে মাটিতে নেমে এসে চাঁদের হাট বসায়। ওদের বয়স হিসেব করতে গেলে, একেবারে পাগল হয়ে, সোজা টিকিট কাটতে যাবে।'

সব শুনে চন্দ্রিকারও ইচ্ছা করল কিছু বলার। একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দুটো টান মেরে বলে, 'তুমি তাই বেশ বলতে পার যেন গ্রামফোনের রেকর্ড বাজছে....দেখ মধুময়, সে তুমি যাই বলনা কেন তোমার এই মিসেস ব্যানার্জীর বয়স তিরিশের চেয়ে একটুও কম হবে না।'

মধুময় সামান্য বিরক্ত হয়ে বলে, 'আরে বাবা, ওর বয়স তিরিশ হলেই বা কি আর ষোল হলেই আমাদের কি। বলি বেল পাকলে কাকের কি—?'

তখন তিনটে বেজে গেছে। সাধারণত তিনটের পর ডাকঘরের কাজের চাপ কম থাকে। কারণ রেজিষ্টারি, মনিঅর্ডার, সেভিং ব্যাঙ্ক এসব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বাকি থাকে ডাকটিকিট, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি বিক্রি আর হিসেব পত্র করা, শীল মোহর মারা ইত্যাদি।

চন্দ্রিকা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলে, 'তুমিতো প্রত্যেকটি কথাকে ঐ একই খাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর। আমার বলার উদ্দেশ্যই হল যে এই চিজের রহস্য জানা উচিত।'

আর সব চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, চন্দ্রিকার নিজের জীবনেই এই প্রশ্নের জবাব

তৈরী ছিল। কাজেই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে তাকে দেখলে মনে হতো যেন তার পিঠে একটা পাহাড়ের বোঝা আছে।....পাঁচটি বাচ্চা, হাঁপানি রোগে ধরা বউ। দৈনন্দিন ঘরোয়া ঝগড়া সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর টাকা পয়সার চিন্তা, ঘরের ভাড়া তিন মাসের অনেক টাকা হয়ে গেছে আর বাড়ির মালিক রিমাইণ্ডারের পর রিমাইণ্ডার দিয়েছে। মনোহরের কাছে দুমাস আগে ছোট ছেলে বীরজুর জন্মদিনের জন্য পঁয়তাল্লিশ টাকা ধার নেয়। আজও সে টাকা শোধ করতে পারেনি। সেও বেচারা বার কয়েক টাকা দিয়ে আজকাল আর কথা বলে না। বউ শকুন্তলাকে কোন এক লেডী ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। জীবনের কোন স্পন্দন তার মধ্যে নেই। এভাবে সংসার কি ভাবে চলবে? কিছু তো করতেই হবে। শকুন্তলা আর সেই আগেকার শকুন্তলা নেই।

তার ঘর এখনও দূরে আছে। পুরোনো আধভাঙা একটা নড়বড়ে সাইকেল চড়ে চলেছে। তার মন তোলপাড় করছে এই সন্ধ্যায়। সারা আকাশ কালো মেঘে ভরে গেছে। হাওয়াও ছিল কিছু। হাওয়া থাকায় তক্ষুনি বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা ছিল কম। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে গায়ে। সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা মনকে তোলপাড় করা সত্ত্বেও অন্য কোন চিন্তা পাশাপাশি থাকার ফলে তার চোখে মুখে কিছু আনন্দের আভাস ছিল। সে ভাবতে লাগল বিয়ের সময়কার শকুন্তলার চেহারা, মিসেস ব্যানার্জীর আর মধুময়ের দেখা দিল্লীর কনট প্লেসের কথা।

ওই সব মহিলাদের সৌন্দর্য কৃত্রিম, নিজস্ব বলতে তাদের কিছু নেই। গোলাপী পাউডারে সারা শরীর ভরিয়ে দেয়। না হলে এ সবের চেয়েও আমার শকুন্তলার আগের চেহারা কিসে কম ছিল? সারা শরীর রক্তের উচ্ছ্বাসে মুখর আরক্তিমতায় অপূর্ব সুন্দর ছিল। এত মোলায়েম শরীর যেন তক্ষুনি জন্মেছে। নাক, কান, হাত সমস্ত কিছুই যেন শিল্পীর সুনিপুণ হাতে গড়া। যৌবন ভরা স্বাস্থ্যের প্রতীক যেন শকুন্তলা। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিকার মনে পড়লো শকুন্তলার সঙ্গে কাটানো অতীতের আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা।....কত মধুর ছিল সেই দিন। কিন্তু কত স্বল্প স্থায়ী। মা তখন গাঁয়ে থাকতেন—কত অল্প টাকা রোজগার করেও ছোট ছোট ঘরে দিনগুলো যেন সুন্দরভাবে কেটে যেত। একি দিন পড়েছে! ঘরের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে। মনোহরের টাকা ফেরত দিতে পারছি না। শকুন্তলাকে ডাক্তার দেখাতে পারছি না।

দুপয়সা বাঁচানোর কথা তো কল্পনাই করা যায় না। ধার ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। অতীতের সেই দিন আর আজকের এই দিনে কত পার্থক্য। সন্ধ্যায়

ফেরার সময় শকুন্তলা জলযোগ করে চা নিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকতো। আর আজ....?

নিজের ঘর যত কাছাকাছি আসে ততই তার রোমাঞ্চের রঙ্ ফিকা হয়ে বাস্তবতার নগ্নরূপ প্রকটভাবে দেখা দেয়। ততক্ষণে বৃষ্টিও ফোঁটা ফোঁটা পড়তে শুরু করে। চন্দ্রিকা জোরে প্যাডেল করতে শুরু করে।

গলিতে ঢুকে ঘরের সামনে পৌছতেই প্রথমে সে দেখতে পায় রমেশকে। বৃষ্টি পড়ছে তবুও সে ছেলেটা এক বাড়ির চালের তলায় গুলি খেলছে। গুলিটা ড্রেনে পড়ে গেছে, সেটাকে তুলছে। তাকে সে অবস্থাতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিকার খুব রাগ হয়। সে রাগ কিছুটা দমিয়ে—ছিঃ ছিঃ কি চামারদের মত খেলছিস, চল ঘরে চল। বলে ধমক দেয় নিজের ছেলে রমেশকে।

কথাটি শুনেই রমেশ ছুটে ঘরে ঢুকে যায়। পেছনে পেছনে চন্দ্রিকা বাবু। তুকদম এগুতে না এগুতেই একটা চটি জুতা তার গালে লাগে। মেজাজটা তার দারুণ ভাবে বিগড়ে যায়। ঘরের ভেতরে স্নরেশ এবং দীনেশ, তার তুই ছেলে, ঝগড়া করছিল। তুজনে মারামারি শুরু করে দেয়। স্নরেশ দীনেশের চুল ছিঁড়ে ফেলে। দীনেশ নিজের বড় বড় নখ দিয়ে স্নরেশের গালে আঁচড় টেনে দেয়। স্নরেশের গাল বেয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে। সে দীনেশের চেয়েও দেড় তুবছরের বড়। কিন্তু তবু ছোট ভাইকে ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দীনেশ রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে থাকা চটি জুতো ছুঁড়ে মারে। সেটা স্নরেশের গায়ে না লেগে লাগল তার বাবা চন্দ্রিকা বাবুর গালে। লাগার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিকা বাবু চিৎকার করে বলে, 'হারামীর বাচ্চা!'

লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে সেই হারামীর গালে লাগল তারই বাচ্চাদের জুতো! বাস্তব বড় কঠিন। এতক্ষণ সে সারা পথে ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে যে স্বপ্ন রাজ্যে ছিল, সে স্বপ্ন হঠাৎ যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সাইকেলটা তাড়াতাড়ি বারান্দায় রেখে ঘরের কোণ থেকে এক গাদা দড়ি তুলে নিয়ে ঝাঁঝালো গলায় চিৎকার করে ডাক দেয় স্নরেশ এবং দীনেশকে।

তুই অপরাধী সাড়া শব্দ না করে কাঠের মত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা না বলে সপাং সপাং করে চাবকাতে শুরু করে। মারতে মারতে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'তোমরা আমার রাগ জানোনা না, কাউকে রক্ষা করবো না। হাড় গুঁড়ো করে সাত হাত মাটির তলায় পুঁতে ফেলবো।'

বাচ্চারা বেঁকে গিয়ে হাত বাঁচানোর সময় ছড়ি পড়ছিল পায়ে। পা বাঁচানোর সময় পড়ছিল পিঠে। বাচ্চাগুলোকে কঠোর এবং নির্দয়ভাবে মারধোর করছিল সে।

তারা যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। কিন্তু তাতে চন্দ্রিকা বাবুর মনে কারুণ্য উদয় হয়নি। বাচ্চাদের মা জল তুলতে যাচ্ছিল, ছুটে এসে তাদের জড়িয়ে ধরে বলে, 'থাম না, মেরে ফেলবে নাকি বাচ্চাদের ?'

শকুন্তলার কথায় চন্দ্রিকা বাবুর রাগ আরও বেড়ে যায়। চিৎকার করে সে বলে, 'আলবৎ মেরে ফেলব। আমার কথামত না চললে হারামজাদা গুলোকে পুঁতে ফেলব....এত আর ঘর নয় একটি জাহান্নাম হয়েছে।'

তারপর সমস্ত রাগ ঘুরে পড়ে শকুন্তলার উপর। 'এই তোমার জন্যই এই সব কিছু হয়। তোমাকে হাজার বার বলেছি না, আমি হট্টগোল মারপিট পছন্দ করি না। সারাদিনের খাটুনির পর ঘরে এসে কোথায় শান্তিতে একটু জিরোবো, তারও উপায় নেই।....নিজের ঘরেও কি আমি শান্তি পাবো না ? এইভাবে চললে আর কতদিন আমি বাঁচতে পারবো। আমি যে পাগল হয়ে যাবো দেখছি।'

'পাগল তো তোমার আগে আমিই হয়ে যাবো। আমাকে তো সারাদিন এই অবস্থার মধ্যেই কাটাতে হয়।'

মুরগীর খোপরের মত এই ছোট্ট ঘরে শকুন্তলাই বা কি করবে ? আর এই সমস্যার সমাধান কি করতে পারবে 'তুষ্মন্ত'। একটা কামরা....সে ঘরে সবাই মাথা গুঁজে থাকতো আর তার গা ঘেঁষে ছিল ছোট দুটো খুপরি....তার একটাতে থাকতো মা তাঁর পূজোর সরঞ্জাম আর রামায়ণ পাঁচালী প্রভৃতি নিয়ে। আর অন্যটি চন্দ্রিকাবাবু রেখেছিলেন নিজের পড়াশোনা করার এবং বন্ধু বান্ধবদের বসার জন্য। কিন্তু সে ঘর ব্যবহৃত হত অন্য কাজে।

এই অবস্থায় সেই বা কি করতে পারে ?

চন্দ্রিকার বাচ্চারা বস্তির গলিপথে 'ছোট জাতের' ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, আর ঘরে থাকলে চেঁচামেচি করে। সে যাই হোক না কেন তখনকার মত চাবুকের আঘাতে সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু মাত্র বাচ্চাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজে ঘর ভরে যায়। চন্দ্রিকার এখন মাথা ঠাণ্ডা হলো, জামা কাপড় খুলল। কাপড় বদলিয়ে হাত পা ধুয়ে নাস্তা পাবার আশায় বসে রইলো। বসে বসে সে শকুন্তলার অথবা আজকের বা অতীতের কোন অবস্থার কথা ভাবে নি। ভাবছিল মিসেস ব্যানার্জী সম্পর্কে। তার যৌবন, স্বাস্থ্য এবং জীবন উচ্ছ্বাস সম্পর্কে। তার একটি মাত্র ছেলের কথা। ঐ ছেলের বাবা আর্মিতে কাজ করে। তার ঠাকুর্দা আশু ব্যানার্জী।

নাস্তা পেতে আজ অনেক দেরি হচ্ছে। গরম এক কাপ চা পেলেও মনটা কিছু জুড়াতো। কিন্তু তার কোন খোঁজ খবর নেই। এমনিতেই তার মন বিগড়ে

আছে। এখন তার রাগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কর্কশ গলায় ডাক দেয়, 'শকুন্তলা!'

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল....সেই বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে শকুন্তলার উত্তর আসে ক্ষীণকণ্ঠে, 'আসছি।'

'আসছি' বলার পাঁচ-সাত মিনিট পরে শকুন্তলা কিছু ফুলুরি ও এক কাপ চা নিয়ে ছেঁড়া নোংরা শাড়ি পরে চন্দ্রিকার সামনে উপস্থিত হয়। যৌবনের নাম গন্ধও নেই তার শরীরে, আছে পেঁয়াজের দুর্গন্ধ। এই ধরনের চেহারা দেখতে চন্দ্রিকার খুব খারাপ লাগে। চায়ের পেয়ালাটা মুখে লাগিয়েই সমস্ত চা ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বলে, 'তোমার কি হয়েছে বলতো শকুন্তলা, এক কাপ গরম চাও দিতে পার না।'

চা সত্যি কিছুটা ঠাণ্ডা ছিল। শকুন্তলাকে কাটলেও যেন রক্ত বেরুবে না। শ্বাস প্রশ্বাসও চলেছে কিনা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। অপরাধীর মত সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার মস্তিষ্কে যেন একটি কথাই কেঁদে কেঁদে ঘুরছে, 'আমার দেওয়া চা ফেলে দিল....আমার দেওয়া চা ফেলে দিল।'

তার করুণ মুখ, যন্ত্রনা কাতর চেহারা দেখে পাথরও যেন গলে যায়। কিন্তু চন্দ্রিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

শকুন্তলা কি-বা জবাব দেবে। তার স্বামীতো জানে তার শরীর খারাপ। শরীর খারাপের উপর মনও যদি কোন এক বিষয়ে খারাপ হয়ে যায় এবং তার ফলে এক দিনের জন্য কোন কিছু যদি খারাপ হয়ে যায়, তার কি ক্ষমা নেই? প্রত্যেক দিনতো এই শরীর মন নিয়েই জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই সে করে।

কোন জবাব না দিয়ে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে তার সামনে। আসল কথা, সে দিন ঐ ফলুরি বানানোর আগে চা করেছিল। শরীরটাতো ভেঙ্গে গেছেই; মনও যেন খান খান হয়ে গেছে। পাগুলো যেন আবার ভারি হচ্ছে।

সেই বিষয়েই এক ফাঁকে পড়শিনীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে যায়। ফিরতে সামান্যমাত্র দেরি হয়ে যায়। তার উপর ঘরের এই হৈ চৈ, মন একেবারে খারাপ হয়ে যায়। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে বৃষ্টির দিনে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়াই ভালো, না হলে বাচ্চারা আবার গোলমাল করবে। চা বানিয়ে দিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি সকলের খাওয়া হয়ে গেলে ছুটি হয়ে যাবে। এই সব কথা ভেবে চা বানিয়ে ফেলে। চা বানানোর পর হঠাৎ তার মনে পড়ে এমনিতেই স্বামীর মেজাজ বিগড়ে আছে তার উপর শুধু চা নিয়ে গেলে হয়ত ছুঁড়ে ফেলবে। এই ভয়ে হঠাৎ স্থির করে ফুলুরি বানাবে! সেগুলো বানাতে

এদিকে যে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তা সে খেয়াল করেনি। নাহলে একটু গরম করে আনতে পারতো বৈকি।

এই সব কথা কি করেই বা বলবে। এগুলো কি এই অবস্থায় বলার কথা। কাজেই চুপ করে থাকে। সে ক্লান্ত, বিষণ্ণ কাতরতায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদিকে চন্দ্রিকার মা ছেলের কুরুক্ষেত্র বাধানোর সময় নির্বিকার নিশ্চিন্তভাবে ঠাকুর ঘরে নিজের পূজোতে মনোনিবেশ করলেও এখন হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। নিজের ঘর থেকে ছেলের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলে, 'কাজে মন বসলেতো চা গরম থাকবে। ঘরতো ওর কাছে যেন কয়েদ খানার মত লাগে। মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয় এতক্ষণ কোথায় কাটিয়ে ফিরেছে!'

শকুন্তলার শরীরে যেন আগুন লেগে যায়। কাতরস্বরে বলে ওঠে, 'সারাদিন এই ঘরেই তো পচতে থাকি, আজ না হয় ঘণ্টা খানেকের জন্য নীলুর মার কাছে একটু গেছি, তাতেই যা নয় তাই বলবেন?'

চন্দ্রিকার মা ঠাকুরঘর থেকে রণহুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝালো গলায় বলে, 'দেখছিস, দেখছিস চন্দর আমার সঙ্গে কি ভাবে মুখ নেড়ে, মুখের উপর, কথা বলছে দেখছিস। যেন পারলে জ্যান্ত চিবিয়ে খায়। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য? আমি যেন সব খবর রাখি না....সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে আসবে, আর ও ঘরে বসে বসে এক কাপ চাও করে দিতে পারবে না! আবার বললে মুখের উপর চ্যাটাঙ চ্যাটাঙ করে কথার খৈ ফোটাবে। চন্দর, থাক ওকে আর করে দিতে হবে না। আমার গতর এখনও ফরিয়ে যায়নি।' বলতে বলতে তার মা সশব্দে রান্নাঘরে যায়।

মার কথা চন্দ্রিকার মনের আগুনে যেন আরও ঘি ঢালে। মনটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। দারুণ ভাবে চটে গিয়ে টেনে এক চড়, শকুন্তলার জ্বরে পুড়তে থাকা গালে, কষিয়ে ঘর থেকে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়।

ছেলেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চন্দ্রিকার মা আবার পুজোর ঘরে ঢুকে ধ্যানে বসে পড়ে।

শকুন্তলাও ছুটে গিয়ে উনানে জল ফেলে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফঁপিয়ে ফঁপিয়ে কাঁদে।

স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কোথায়। বাচ্চাগুলো খিদে পাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শাশুড়ী পূজোর ঘরে বসে বিড়বিড় করতে থাকে। বলা যায় না সে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছিল কিনা।

বৃষ্টি তখন পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে।

সেই শাওন অন্ধকার রাত্রে স্বামী ছিল না ঘরে। তার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বালিশের এক কোণ ভিজে গেলে অন্য কোণে মাথা রেখে মার খাওয়া গালে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকার ঘরে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। কেন জানিনা তার শুধু মনে পড়ছিল বিয়ের সময় বান্ধবীদের গাওয়া লোকগীতি। বিয়ের গান, আর মনে পড়ল নিম আর মহুয়ার গাছে ঘেরা মিষ্টি পরিবেশে, সেই লোকগীতি গাওয়া, তাদের গাঁয়ের এক গোয়ালিনী যুবতীর কথা। মেয়েটি ছিল তাদের গ্রামের সকলের সেরা, স্বাস্থ্যে, গৃহস্থালী কাজে, প্রত্যেক বিষয়ে। বিয়ের বছর কয়েক পরে গাঁয়ের লোকের মুখে জানতে পারে সে নাকি বিয়ের পর একদিন স্বামীর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া হওয়ায় ভোঁতা কাস্তে দিয়ে নিজের গলা নিজেই কেটে ফেলেছে। আজ না জানি কেন শকুন্তলার সে কথা বারে বারে মনে পড়ছে।

আসল নকল

কেশব চন্দ্র ভর্মা

আসল গল্প

সে তাকে ভালবাসত।

(ভাল এই জন্য বাসত যে প্রথমত সে বয়সটাই ছিল ভালবাসার—আর দ্বিতীয়ত ভালবাসা ছাড়া তার অন্য কোন কাজকর্ম ছিল না।)

তাকে ছাড়া সে থাকতে পারত না !

('তাকে ছাড়া' কথাটির অর্থ হল ঠিক সেই সময় কোন একটি তরুণীর কাছে সে ছিল। ইতিপূর্বে কতজনকে যে সে 'তাকে ছাড়া' চলবে না বলেছে তার ফিরিস্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।)

* সেও তাকে ছাড়া থাকতে পারত না।

(সত্য কথা বলতে কি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময় সে অর্থাৎ তরুণী তাকে ছাড়াই থাকত।)

* বাপ-মা সময়মত ভাল ঘর এবং ভাল পাত্র দেখে তার বিয়ে দিয়ে দেয়।

(ভাল ঘর এবং ভাল পাত্র পাওয়ার জন্য আর পাঁচটি মেয়ের মত সেও আকাঙ্ক্ষিত ছিল।)

* সে ইতিমধ্যে একটি ভাল চাকরির খোঁজ পেয়ে ঘুষ এবং ব্যাকিং-এর জোরে তা জোগাড় করে অন্য কোথাও গিয়ে জীবন যাপন করতে থাকে।

(চাকরি এবং ভালবাসার মধ্যে যখন যে কোন একটিকে বাছাই করার প্রশ্ন প্রকট রূপ ধারণ করে তখন আর চারজন যা করে সেও তাই করল।)

* তারপর দুজনে রাজ্যপাট পেল, আর পাঁচজনের মতই।

(অর্জিত আশীর্বাদ অনুসারে নায়ক পেল সরকারী চাকরি অর্থাৎ রাজ্য এবং নায়িকা রান্নাঘরের পিঁড়ি অর্থাৎ পাঠ। অতএব ঐ দুজনে রাজ্যপাট পেল।)

নকল গল্প ॥ এক নম্বর

রমেশ সুনীতাকে অসময়ে ফিরতে দেখেও কোন প্রশ্ন না করে শুধু তার দিকে আড়চোখে একবার তাকাল।

সুনীতা বলল, 'যা হোক একটা কিছু ঠিক করতেই হবে। গাজিয়াবাদে কোন

এক পাত্রের সঙ্গে মা একেবারে পাকা কথা দিয়ে দিতে চাইছে।'

'যা করতে হয় তুমি ঠিক কর সুনীতা। মনে মনে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।'

'দেখ, আমি নিজে মুখ ফুটে মাকে কিছু বলতে পারবো না। বুঝতেই তো পারছো আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে মা ক্ষেপে একেবারে আগুন হয়ে যাবে। মার কাছে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সংসারে আর কেউ বড নয়।'

রমেশও ততখানি সাহসী ছিল না। ফলে সুনীতার বিয়ে ডেপুটি কালেক্টার সুরেশের সঙ্গে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন :

'দেখ রমেশ তুমি আমার জন্যে জীবন নষ্ট কর না। আমি যে এখন অন্যের, আমার এই দেহের উপর তোমায় যে কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমার মন তোমারই ছিল আর তোমারই থাকবে।....বল তুমি আমার কথা রাখবে?....আমার মাথার দিব্যি।....'

রমেশ চুপ করে থাকে।

'দেখ তুমি কি পার না আমার জন্য একটি বৌদি আনতে....হ্যাঁ আমারই জন্য। আমি জন্ম জন্মান্তরে তোমার এ উপকারের কথা ভুলব না। (নিজের ছেলেকে) দেখ বাবু, ইনি তোমার মামা। প্রণাম কর। ওভাবে নয় হাত দিয়ে।' (তারপর রমেশ সুনীতার কথামত বিয়ে করে।)

নকল গল্প ॥ দু নম্বর

রেখার হাত প্রকাশ যেই নিজের হাতে নিল, মুহূর্তে রেখা কেঁপে উঠল। মিলনের প্রথম রাত্রির সমস্ত সুখের উপর কে যেন এক চাক বরফ ছুঁড়ে মারল। ঠিক এমনি করেই তো একদিন ললিত তার হাত ধরেছিল আর তখন সে বলেছিল, 'এই হাত সারাজীবন অন্য কেউ যেন না ধরতে পারে।'

কিন্তু দেখতে দেখতে সেই হাত অন্যের হাতেই চলে গেল। প্রথমে রেখাই হাত বাড়িয়েছিল পরে কি যেন মনে পড়াতে প্রকাশের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু এই ধরা-ছাড়ার খেলায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হল প্রকাশ। রেখা অগত্যা পাথরের মূর্তির মত বসেছিল। প্রকাশ তার শরীর নিয়ে খেলতে লাগল।

রেখার মনে পড়ে ললিতের কথা। সমস্ত রাত ধরে স্মৃতির যমুনার তীরে আছড়ে আছড়ে পড়ে ললিতের স্মৃতি। কত কথা কত হাসি কত গান। অবশেষে প্রকাশের হাতের পুতুল।

নকল গল্প ॥ তিন নম্বর

মিস চৌধুরীর চোখ লাল হয়ে উঠল। সোনালী রেশমী চুল পাথার বাতাসে

ঢেউ খেলে খেলে উড়তে থাকে। ঘোষ হঠাৎ বলল, 'আর একটু দেব?'

মুহূর্তে মিস চৌধুরীর চেহারা যেন আলো ঝলমল করে উঠল। সমস্ত চাঁদের আলো যেন তার কম্পিত দেহে ঝরে ঝরে পড়ে।

—না, আর দিতে হবে না, তুমি যাও। আমি সাহাকে তিনটের পর আসতে বলেছি। ওর আসার সময় হয়ে গেছে। তুমি যাও।

ঘোষ যাওয়ার জন্য উঠে মিস চৌধুরীর গালে বিদায় চুম্বন রেখা এঁকে দেয়। দরজা পর্যন্ত যেতে না যেতেই ওরা দেখতে পেল সাহাকে। সাহা সানন্দে ঘোষের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলল, সে কি চললেন? তারপর কেমন আছেন? এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল?

ঘোষ মুচকে হেসে সাহার হাতে চাপ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিস চৌধুরী দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সাহার হাতে ভর করে টলতে টলতে কুমারী চৌধুরী সাহাকে নিয়ে নিজের কক্ষে ঢুকে গেল।

নকল গল্প ॥ চার নম্বর

অনেকক্ষণ ধরে দরজা আধা ভেজানো ছিল। বৌদির চোখ দরজার উপর নিবদ্ধ। কিসের অপেক্ষায় যেন আছে। মাঝে মাঝে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ডানদিকে বাঁ দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। মোষ চরিয়ে ফেরার পথে বৌদির সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না এমন দিন প্রায় নেই....পরসোত্তম জেনে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। খুন খারাবি হবেই। কিন্তু পরসোত্তম এখন আসবে কোত্থেকে? যেদিন থেকে সে কালোবাজারী ব্যবসা শুরু করেছে সেদিন থেকে সে কোন না কোন ধান্দায় ঘুরছে। অগত্যা নিহোরকেই দাদার করণীয় 'পারিবারিক' কাজ করতে হয়।

নিহোর প্রত্যেকদিন কত আবেগের সঙ্গে বলে, বৌদি এমন সোনালী নিটোল যৌবন নষ্ট করো না। যথেষ্ট অন্ধকার হয়ে গেছে....পথে লোকজন কেউ নেই.... তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করো....অথচ আজ সেই নিহোর এখনও এলো না...বউ ছটপট করে ওঠে....তার মোষ চরানো মাঠের দিকে যাবে কি না ভাবে....অবশেষে 'ময়দানে' যাওয়ার নাম করে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নকল গল্প ॥ পাঁচ নম্বর

আয়া পালঙ্ক থেকে নামার পর তার কোমরে হাত চালিয়ে দিয়ে তাকে কাছে টেনে গোপালবাবু তার বুকের খাঁজে মুখ গুঁজে উত্তপ্ত প্রশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কাছে, আরও কাছে টেনে নিতেই ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে আয়া বলে,

'বাবু এবার আমাকে ছেড়ে দিন ! দিদিমণির আসার সময় হয়ে গেছে !'

গোপালবাবু আর্তনাদ করে উঠল যেন, 'না না আমি আর তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না, কোনক্রমেই পারব না। তুমিই আমার সব, আমি তোমার বুকে, এইভাবে বিভোর হতে চাই, হারিয়ে যেতে চাই...আমি যে তোমার—যুগ যুগ ধরে, জনম জনম জনম ধরে....'

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। গোপালবাবুর বউ এসে গেছে স্কুল থেকে। আয়া রান্নাঘরে ছুটে গেল দুধ গরম করতে। গোপালবাবু দরজা খুলল। বউ ঘরে ঢুকল। গোপালবাবু বউ-এর কোমরে হাত ঢুকিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল, "আমার প্রাণেশ্বরী, তুমি স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরি করলে কেন। তুমি যখন থাক না আমার অবস্থা যে তখন কী হয় তা তুমি কল্পনাও করতে পার না। খালি ভাবছি, কখন তুমি আসবে, কখন পাব তোমার হাতের এক কাপ চা....তুমি যে কেন আরও তাড়াতাড়ি ফের না....কেন যে এত দেরি কর....'

বউ বলে, 'কেন আয়া আসে নি এখন ? চারটে যে বাজে....'

—কে জানে, শালি এসেছে কি না। দেখ ওদিকে গিয়ে এসেছে কি না।

নকল গল্প ॥ ছয় নম্বর

এক ধোঁয়াটে আলোর ল্যাম্পপোস্ট আর তার আশেপালে দুটি রাস্তা। একটি অন্যটিকে ছোঁয়নি। পাশাপাশি কতদূর গেছে কে জানে। ল্যাম্পপোস্ট ছোটে না।

গলে যাওয়া মোমবাতির মত গাড়ি যেন এপাশ-ওপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

পথগুলো কেমন যেন আজকাল ধোঁয়াটে আলোয় আবছা, অপরিষ্কার। অসুস্থ ল্যাম্পপোস্টের পেছনে সমস্ত হলুদ-আবছা আলোর জমাট যন্ত্রণা।

কুকুরগুলো ল্যাম্পপোস্টের কাছে আসে। কেমন বোকা বোকা চাউনি ওদের। গোঁ গোঁ করে। যা করার তা করে, করায়। তারপর আগের মত পথে ঘোরাঘুরি করে। প্রত্যেক পথেরই নিজস্ব কুকুর আছে। কুকুর ! ছি !

পুনশ্চ

একজন সমালোচক

একদল লোকের মধ্যে বসে টেবিলে মুঠি ঠুকতে ঠুকতে—প্রেমচন্দ ! প্রেমচন্দ ?....অজ্ঞেয়—জৈনেন্দ্র ধু ! ফু !! কাফ্‌কা....বৈকেট....মূল ত্রিকোন ? বর্জিনিয়া উল্‌ফ....ক্যাচ মি ইফ্‌ যু ক্যান। এই যে গল্প লেখকদের সম্পর্কে....।

অন্যজন বলে (ক্ষেপে উঠে)....গেট আউট....বেরো

একজন পাঠক (ট্রেন ধরার ব্যস্ততার সঙ্গে বুকস্টলে গিয়ে)

কোই তাড়াতাড়ি....এই যো পয়সা....যে কোন একটা ভাল....চটকদার....আঃ তাড়াতাড়ি....উফ্‌ ট্রেন ধরতে হবে যে....

শীতের রাত

ছেদীলাল গুপ্ত

এমন একটি ঘটনা বলতে যাচ্ছি যা অবিশ্বাস্য অথচ সত্যি।

শীতের শেষের 'একটি দিন। বসন্ত সমাগত প্রায়।' রাত্রির অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীর বুকে। একপাশ দিয়ে আমি চলেছি। কোথায় যাবো ঠিক নেই।

ফুটপাতের দোকানগুলো আলো ঝলমল! রেস্তোরাঁয় লোকের জটলা। পথে গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত। পায়ে হাঁটা লোকের সংখ্যাও কম নয়। এই শহরে আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছি।

রেস্তোরাঁ দেখার সঙ্গে সঙ্গে পা থেমে যায়। মন চলে যায় ভেতরে। কিন্তু পকেটে হাত ঢোকানোর পর সেই ইচ্ছা উবে যায়। পকেটে দুচার গণ্ডা পয়সা আছে।

এক পান বিড়ি সিগারেটের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাবছি কোন সিগারেট কিনব। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর দোকানদার বিরক্ত হয়ে আমাকে একটা বিড়ি দিয়ে চলে যাওয়ার ইশারা করে।

আবার পথ চলা। লোকের ভীড় কমে গেছে। ল্যাম্প-পোস্টগুলো অনেক দূরে দূরে। রাত বেড়েছে। হঠাৎ এক আওয়াজ পেলাম, 'ওহে ও পথিক শোন, শুনে যাও।' ঘুরে দেখি এক বন্ধ দোকানের সামনে সাধু বসে আছে। কালো ঘন দাড়ি, গেরুয়া বস্ত্র, সারা শরীরে ছাই মাখা।' আমি তার কাছে গেলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে ওঠে, 'তোমার কপালে রাজকুমারদের জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। মনে হচ্ছে তুমি কোন বিরাট বড়লোকের সন্তান। তোমার মন খুব পরিষ্কার। কোন পাপ নেই তোমার মনে। আর তুমি বুদ্ধিমান। এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে লোককে ধোঁকা দিচ্ছ কেন?

সে কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে গেল। শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। প্রথমে অবাক হলাম। তারপর নিজের কাপড় জামার দিকে তাকি তাকিয়ে হেসে ফেললাম। সাধু বলল, 'আচ্ছা এখন এই বাবাজির ভোজনের ব্যবস্থা করে দাও। তোমার মঙ্গল হবে।'

ভোজন করানোর কথা শুনেই আমার আত্মারাম যেন খাঁচাছাড়া হল। তবু ঐ

নিয়ে তাকে বকাতে চাই না। পকেট থেকে এক আনা বের করে ফেলে দিলাম তার সামনে। পয়সা পড়ার আওয়াজ আমার কানে যেতেই চমকে উঠলাম। পথ চলার সময় যেন আমারই পকেট থেকে পয়সা পড়ে গেছে। শুধু তাই নয় ইচ্ছে করল আনিটা তুলে নিই। কিন্তু সেই মুহূর্তে সাধুর বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় আমার হাত চলে গেল। সে 'হো' 'হো' করে হেসে ফেলল। আমার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টি হেনে বলল, 'ব্যস, এই তোমার মুরোদ।'

আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ি। বড় এক পার্কে ঢুকি। কিছু আলো তার চেয়ে অনেক বেশি ছায়া; মাঝে মাঝে দু'একটি ছায়া ঘেরা পথ। চাঁদের আলো পড়েছে। যুবক যুবতীরা ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে বসে আছে। ওদের পাশ দিয়ে আমি ঘুরছি। ওদের কাণ্ড আমি দেখছি। আমাকে দেখার অবকাশ ওদের নেই। ঘুরতে ঘুরতে পার্কের এক কোণে নিরিবিলিতে বসি।

বসতে না বসতেই ছোট এক ভিখারিণী মেয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। যেন আমাকেই সে খুঁজছিল অনেকক্ষণ ধরে। আসলে সে যাকে খুঁজছিল সে হয়তো আমি নই। অনেকক্ষণ ধরে তাকে চেষ্টা করলাম আমার কাছ থেকে সরাতে।

রাত গভীর হয়েজে। একে একে পার্কের লোক চলে যাচ্ছে। আমি ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে করে পার্কের প্রত্যেকটি ছোট ছোট জটলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি তাদের মেয়ে কিনা। কিন্তু ঐ নোংরা জামা পরা মেয়েটিকে কেউ স্বীকার করলো না নিজের বলে।

আচ্ছা বিপদে পড়লাম। কি করব ঠিক করতে পারছি না। আবার তাকে কোলে করে পার্কের যে কোণে বসেছিলাম সে কোণে গেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে যে পথে পার্কে ঢুকেছি সেই পথ দিয়ে গেলাম সাধুর কাছে। সেই সিগারেটের দোকানের কাছে। এগিয়ে গেলাম সেই রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে।

আমি আগের মতই ঐ রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়ালাম। ভিতরের বয়-বাবুর্চি আচকান নাবিয়ে খেতে বসেছে। তাদের মধ্যে একজন আমাকে দেখার পর অন্যদের কি যেন বলল। তারপর আমাকে ডাক দিল, 'এই এদিকে আয়।'

ভিতরে ঢুকতে আমার ভয় করেছিল। কিন্তু সাহস করে ঢুকে গেলাম। সে আমাকে কিছু খেতে দিল। আমি রাগ না করে বেরিয়ে গেলাম রেস্তোরাঁ থেকে। ফুটপাথে বসে রইলাম। রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ফুটপাতে জামা বিছিয়ে বাচ্চা মেয়েটাকে শুইয়ে দিলাম, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনে খাবার রেখে ভাবছি বাচ্চাটারও হয়তো খিদে পেয়েছে।

বারবার খাবার তুলে খেতে যাই কিন্তু পারি না। বাচ্চাটার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। না খেয়ে অনেক রাতই তো কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্যের না খাবার প্রশ্ন আমার জীবনে কোনদিন দেখা দেয়নি। এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

ইচ্ছা করলে বাচ্চাটাকে ঐখানেই শুইয়ে রেখে আমি সরে পড়তে পারি। কিন্তু বিবেকে বাধছে। ভোরের প্রতীক্ষায় এভাবে বসে থাকার কোন মানে হয়? আমি ভবঘুরে। পথ চলাইতো আমার কাজ।

নানা প্রশ্ন মগজে তালগোল পাকাচ্ছে। মেয়েটা সকালে উঠবে, কাঁদবে, তাকে চুপ করাতে হবে। এত ঝামেলা পোয়াব কি করে? নিজের দীন অবস্থার উপর আজ আমার খুব বিরক্তি ধরল। ঘৃণা হোল আমার উনত্রিশ বছর বয়সের উপর। পরিতাপের সীমাপরিসীমা নেই। খালি পালাতে চায় আমার মন। নিজের উপর বিরক্তির শেষ নেই।

ভিতর থেকে কে যেন আমাকে শুধোল। এই যে কচি প্রাণ দেখছো সামান্য একটা মাংসের পুঁটলির মত দেখতে, এই-ই আগামী দিনে সুন্দর সকাল আনবে।

আগামী দিন কি এত মহত্বপূর্ণ হবে? আমি বিস্মিত হই। সান্ত্বনার নিশ্বাস ফেলি। এ প্রতীক্ষা মন্দ নয়।

কিন্তু এখন দুধ আনব কোত্থেকে? বাচ্চাটার জন্যে অন্তত কিছু দুধ দরকার।

দুধের এক দোকানে আলো তখনও জ্বলছে। ছুটে গেলাম সেদিকে। যেতে না যেতেই দোকান বন্ধ হয়ে গেল। একটি আলো সাইন বোর্ডের উপর ছিল।

ইচ্ছে করল। ঐ রেস্তোরাঁর দরজায় ঘা দিয়ে ওদের তুলে কিছু চাই।

ফিরে এলাম বাচ্চাটার কাছে। এসে দেখি একটা বয়স্কা মেয়েছেলে পার্ক থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসছে। আমি একদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছি। সে যতই এগিয়ে আসে আমার দম নিতে যেন ততই কষ্ট হচ্ছে। সে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি থতমত খেয়ে যাই। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে ঐ বাচ্চার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় তাকে তুলে চুমু খায় তার হাতে, তার গালে, তার কপালে তার ঠোঁটে ...

তারপর সে আমার দিকে তাকায়। আমি অবাক দৃষ্টি মেলে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি এর মা?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। পরক্ষণেই ঠোঁট নেড়ে বলে, 'না।'

'বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল?'

আবার সেই হ্যাঁ এবং না এর মাঝামাঝি একটা উত্তর পেলাম। ঐ অদ্ভুত পরস্পর বিরোধী অভিব্যক্তি দেখে আমার মনে এক রহস্যজাল বিস্তারিত হল।

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তাহলে তুমি কে?'

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে নীরব ছিল। নিস্তব্ধ কঠিন রাত্রের মতই সে ছিল নীরব।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। আমি গর্জে উঠে জিজ্ঞাসা করি, 'বলছ না কেন?'

সে কান্নার ভেঙ্গে পড়ে। তারপর এক নিশ্বাসে বলে যায়, 'আমি এক অভাগিনী। পৃথিবীতে নিজের বলতে আমার কেউ নেই, আমি মা বটে, কিন্তু আমি সন্তানের বোঝা বইতে অক্ষম। আমার সন্তানের বাবা যে কোথায় আমি তা জানি না। যুদ্ধে সে ভর্তি হয়েছিল। আজও সে ফেরেনি। আমিই সেই মা যে নিজের পেটের বাচ্চাকে পার্কে ফেলে এসেছি। শুধু একটি আশায়, যাতে কেউ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। কোলে পিঠে করে মানুষ করে....'

তুচ্ছবিষয়

মহীপসিং

প্রফেসর মাহিন্দর সিং কলেজ থেকে বাড়ি এসেই, তার কোট এবং টাই বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেললেন। তাঁর ছোট্ট মেয়ে পাপ্পী, বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, স্ত্রী সুরজীত রান্নাঘরে খাবার গরম করছে। 'করছ কি? পাগড়িটা খুলো না।' সুরজীত চেঁচিয়ে বলল। শরীর গরম, বাইরে থেকে ঘেমে এসেছে ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। সব সময়ই বলছি, কিন্তু তুমি কখনো আমার কথা শোন না।'

মাহিন্দর ইতিমধ্যে পাগড়ি খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখেছেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। সুরজীত টেবিলের উপর খাবার রেখে, বিছানা থেকে কোট, টাই তুলে হ্যাঙ্গারে টাঙ্গিয়ে রাখল। সে সহজ ভাবে বলল; 'জামা কাপড় ঠিক ভাবে রাখার ব্যাপারে তুমি কোন কষ্ট করতে চাওনা। জামায় যদি ভাঁজ পড়ে যায়, কাল কলেজে কি পরে যাবে?'

মাহিন্দর একটু হাসলেন। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেন। সুরজীত জলের গ্লাস ভর্তি করে, ঠিক যখন খেতে বসবে, পাপ্পী মসলিনের চাদরের তলায় নড়ে উঠল। 'ঠিক সময় উঠছে........' সে চুপি চুপি বলল। বিছানার কাছে তাড়াতাড়ি এসে, বাচ্চাকে সে চাপড়াতে শুরু করল।

চামচ দিয়ে ঝোল নাড়তে নাড়াত অধৈর্য হয়ে মাহিন্দর বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর। দুটো বেজে গেছে। আমার আজ দফারফা।'

'আমার ও তাই। পাপ্পী যদি ঘুম থেকে উঠে পড়ে আমাদের দুজনকেই খেতে দেবে না। তুমি বরং শুরু করে দাও।' সুরজীত বলল।

ঘুম পাড়ানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। শেষে পাপ্পাকে খাবার টেবিলের কাছে নিয়ে আসতে হল। পাপ্পী নিজের গা নোংরা করল। পাপ্পী রুটি নিয়ে এদিক ওদিক ছুঁড়তে লাগল। নিজের গা নোংরা করে সব্জির ঝোলটা একেবারে নষ্ট করে দিল। বাচ্চাটার দুষ্টুমিতে সুরজীত একটুও শান্তিতে কাটাতে পারে না। মাহিন্দরও শাসনের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠেন 'আরে! চোপ!' কোন রকমে তাদের খাওয়া শেষ হল।

দেশ থেকে অনেক দূরে, দুবছরের জন্য মাহিন্দর বোম্বাইয়ের এক কলেজের লেকচারার। প্রথম বছর সে হোটেলেই থেকেছে কারণ অনেক চেষ্টা করেও মনেরমত কোন বাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেন নি। দ্বিতীয় বছরে, অনেক এদিক ওদিক ছোটাছুটির পর কলেজের থেকে দশ মাইল দূরে এক ছোট্ট নোংরা কুঁড়ে পাওয়া গেল। স্থানীয় লোকদের কথা অনুযায়ী সেটাই ঘর অ্যাখ্যা পেয়েছে। একটা মাত্র ঘর, কোণের দিকে আবরণ তৈরী করে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাড়া মাসে ৪০ টাকা, ছ মাসের ভাড়া অগ্রিম। একটা মাত্র সান্ত্বনা যে টাকা ঘুষ দিতে হয়নি। যদি তাই করতে হত, বাস করা দূরে থাক তিনি ঘর দেখতেও আসতেন না। কিন্তু বোম্বাইয়ের মত শহরে তার মাইনে অনুযায়ী এর থেকে ভাল ঘর পাওয়া অসম্ভব।

খাওয়া শেষ হলে হাতের উপর একটা ম্যাগাজিন ধরে মাহিন্দর বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। পাপ্পীকে তাঁর পাশে বসিয়ে দিয়ে, সুরজীত বাসনপত্র ধুতে গেল। অনেক বার মাহিন্দর সাহায্যকারী হিসাবে একটা লোক ঠিক করতে বলেছে। সে বাসনপত্র এবং কাপড় জামা পরিষ্কার করবে আর সন্ধ্যা বেলায় পাপ্পীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার উত্তরে সুরজীতের বক্তব্য বোম্বাই এর মত শহরে দুশো পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকুরের পক্ষে চাকর রাখা চলে না! তা ছাড়া কিছু টাকা জমানো দরকার। জরুরী প্রয়োজনে বিদেশে কার কাছে সাহায্য পাবে। এই যুক্তির পর মাহিন্দরের আর উত্তর দেবার ক্ষমতা ছিল না।

মাহিন্দর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, সুরজীত স্নান শেষ করে, সৌভ ধরাবার কাজে ব্যস্ত। বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর চিৎকার করে ডেকে বললেন, 'কই আমাকে এক গ্লাস জল দাও।' সকাল বেলা প্রথমেই এক গ্লাস জল পান করা তাঁর বহু দিনের অভ্যাস। সুরজীত স্টোভের উপর কেটলিটা চাপিয়ে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে আবার ছুটে রান্না-ঘরে চলে গেল।

মাহিন্দর ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছটা বাজে। কাগজটা তুলে নিয়ে বড় বড় খবরগুলোর উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর সুরজীত তাগাদা দিল, সকালের জল খাবার প্রায় তৈরী। স্নান সেরে জামা কাপড় পরে নাও। 'কলেজে যেতে দেরি হলে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।'

মাহিন্দর দাঁড়িয়ে হাই তুললেন, তারপর শরীরটাকে টান টান করে চারদিক তাকিয়ে বললেন, 'তোয়ালেটা কোথায়?'

'তারের উপর নেই?'

তাঁর চোখ তারের উপর চলে গেল। দেখলেন হ্যাঁ, তোয়ালেটা ঐ খানেই আছে। তারপর সাবানের বাক্স এবং টুথ্ পেস্ট তাক থেকে নিলেন। কিন্তু টুথ ব্রাশটা পাওয়া যাচ্ছে না। 'আমার টুথ ব্রাশ কোথায় ?'

'তাকের উপর নেই ?'

'আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'ভাল করে দেখ। ওখানেই কাছাকাছি কোথাও আছে।'

'আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

এমন সময় পাপ্পী জেগে উঠল। সুরজীত এসে, বাচ্চাকে বিছানা থেকে তুলে মাহিন্দরের কোলে দিয়ে বলল, 'একটু ধর, আমাকেই তো টুথ ব্রাশ খুঁজে দিতে হবে।' পাপ্পী তার বাবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর ছোট্ট হাতটা তুলে নাকটা খামচানো শুরু করল।

'এই তো এখানে।' মাহিন্দরের হাতে টুথ ব্রাশটা দিয়ে সুরজীত বলল, 'এই খানেই পড়েছিল, তুমি নাক বরাবর ছাড়া কিছুই দেখতেই পাও না। শুধু তোমার প্রয়োজনেই একজন চাকর রাখা দরকার।'

মাহিন্দর হেসে বললেন, 'দেখ, তোমাকে ছাড়া আমি সত্যিই অসহায়। আশ্চর্য হয়ে যাই আমি গত বছর কি ভাবে হোটেলে কাটিয়ে ছিলাম।'

তাঁর কথায় সুরজীতের রাগ জল হয়ে গেল। সে আবার রান্না ঘরে ফিরে গেল এবং সেখান থেকে ডিসে আওয়াজ করে বলল, 'কারুরই নিষ্কর্মা হওয়া ঠিক নয়। নাও তাড়াতাড়ি কর।'

ঠিক এই ভাবেই মাহিন্দর সুরজীতের কাছে নিষ্কর্মার মত দিন কাটায়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভোর বেলায় চোখ খোলার পর অবিরাম চেঁচিয়ে যান —জল....তোয়ালে ....ব্রাশ....পেষ্ট...। কল ঘরে গিয়েও এটা কি ওটা নিয়ে যেতে ভুলে যাবেন। সুরজীত যদি দেখে মনে করিয়ে না দেয় তবে কলঘর থেকে থেকে সেই জিনিসের নাম করে চিৎকার করবেন। তখন সব কাজ ফেলে অর্থাৎ উনুনে দুধ হয়ত উথ্‌লে পড়তে পারে বা পাপ্পী রান্না ঘরে গিয়ে কোন জিনিস তছ্ নছ্ করতে পারে বা রান্নার পাত্রে হাত দিয়ে নিজেকে পোড়াবে এ সব কথা ভুলে গিয়ে সুরজীতের ছুটতে হয় তাঁকে সাহায্য করতে। স্নানের পর তাঁর দাড়ি কামাবার জিনিস পত্র যথা—এক কাপ জল, দাড়ি বাঁধার কাপড়, কালো ফিতে, কলেজ যাবার সরঞ্জাম সবই তাঁকে গুছিয়ে দিতে হবে। যদি পাপ্পী বিরক্ত করে, তা হলে মাহিন্দর চেঁচাতে থাকবেন, 'শুনছো পাপ্পীকে একটু নিয়ে যাও। আমার ফিক্সোর বোতল ভেঙ্গে ফেলবে।' সুরজীত পাপ্পীকে ডেকে নিয়ে যাবে, নচেৎ

তাকে দৌড়ে রান্নাঘর থেকে এসে সামাল দিতে হবে।

সময় সময় সুরজীত একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যেদিন বোম্বাই-এ প্রথম এল, হঠাৎ পাপ্পী সেদিন দুধ খেতে চাইল না। যে মেয়ে প্রতিবার পাঁচ আউন্স দুধ না হলে কান্না কাটি করে, সেদিন সে দুধের বোতল মুখে দিতেই চাইল না। মাহিন্দর তার জন্যে টিনের দুধ এনেছিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই তা মুখে দিল না। সে তখন মায়ের বুকের দুধই বেশি খেত। ফলে মাকে সে ছাড়তে পারছিল না। যতক্ষণ মাহিন্দর বাড়ি থাকতো, বেশির ভাগ সময় লেখা পড়া নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। সুরজীত তখন বাচ্চাকে তাঁর কাছে একটু রেখে এলে উনি রেগে যেতেন এবং বাচ্চাকে তাঁর মায়ের সামনে বসিয়ে দিয়ে আসতেন। ফলে বাচ্চা তার মাকে শান্তিতে কাজ করতে দিত না। হয় সে তার ঘাড়ে উঠবার চেষ্টা করত নয়তো কোলে শুয়ে থাকতে চাইত।

একদিন সকালে, সুরজীত দেখল মাহিন্দর একটা ট্রাঙ্ক ওলোট পালট করছেন এবং গর্জাচ্ছেন। তাঁর চারপাশে অন্যান্য ট্রাঙ্কের জিনিসপত্র বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ানো ছিল। স্তূপীকৃত জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে সুরজীত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি করছ?'

মাহিন্দর চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'তুমি ছিলে কোথায়? আমার মোজা কোথায়? আমি সমস্ত ট্রাঙ্কে দেখেছি। এক জোড়াও খুঁজে পেলাম না।'

'আমি পাপ্পীর ফ্রক কাচছিলাম। কিন্তু তুমি কি ভাবে জিনিসগুলো তছনছ করেছ? মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে।' একটা ভাঙ্গা ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে সুরজীত ম্যাজিকের মত এক জোড়া পরিষ্কার মোজা বের দিয়ে বলল, 'তুমি যদি একটু যত্ন করে নজর দিয়ে খুঁজতে তাহলেই পেতে। সব জিনিস এলেমেলো করেছ। দেখ কি বিশৃঙ্খল অবস্থা।'

মাহিন্দর রুক্ষ মেজাজেই ছিলেন। স্ত্রীর কথা শুনে আরও রেগে বললেন, 'শোন, যতক্ষণ না আমি বেরিয়ে যাই, ততক্ষণ তুমি এই ঘরের মধ্যে থাকবে। বুঝেছ? তুমি জান, তোমাকে আমার সব সময় দরকার হয়। মনে থাকবে?'

সমস্ত অভিমান চেপে সুরজীত হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'আচ্ছা রাগ কোরোনা, একটা কথা বলি। আমি যখন তোমার কাছে থাকি না, তখন তুমি নিজেকে চালাও কি করে?'

'ঠিকই চালাই।' মাহিন্দর জোর দিয়ে বললেন। 'আমার অভ্যাস খারাপ করার জন্যই তখন যে তুমি ছিলে না।'

সেই সন্ধ্যায় মাহিন্দর কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখলেন সুরজীত খুব রেগে

আছে। সারাদিন সে কোন বিশ্রাম পায় নি। তার দৈনন্দিন কাজের উপর সেদিন সকালে বেশির ভাগ সময় ট্রাঙ্কগুলো গুছোতে লেগেছে। তার উপর পাপ্পীও সর্বক্ষণ তাকে বিরক্ত করেছে। যখন সে রাত্রের খাবার করছিল তখন হাঁক পাঁক করে পাপ্পী রান্নাঘরে যাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সুরজীত দেখতে পেল পাপ্পী স্টোভের কাছে গিয়ে পড়েছে। এক্ষুনি দুর্ঘটনা ঘটাবে! দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাপ্পীকে ধরবার জন্য সে ছুটে এল। আর স্টোভের উপরের তরকারির কড়া তার কনুই লেগে উল্টে পড়ল। ঐ গরম ঝোল তার শাড়িতে মাখামাখি হয়ে গেল এবং কয়েক ফোঁটা পাপ্পীর গায়ে পড়াতে সেও চেঁচাতে লাগল। সুরজীতের প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা। যাই হোক নিজেকে সামলে নিয়ে শাড়িটা ছেড়ে ফেলল এবং পাপ্পীর পোড়া জায়গায় নীল কালি লাগিয়ে দিল। তারপর পাপ্পীকে ঘুম পাড়াবার জন্য বুকের দুধ খাওয়াতে বসল। মানসিক দিক থেকে সে এমন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে তার কোন সময়ের জ্ঞান ছিল না। ফলে যখন তার স্বামী এল তখনও তার রান্না শেষ হয়নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অভ্যাস অনুযায়ী মাহিন্দর কোট এবং টাই বিছানার উপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে।' সুরজীত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তার কোলে ঘুমন্ত পাপ্পীর দিকে একবার চাইল। তারপর বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে সে বলল, 'খাবার তৈরী হয়নি।'

'তৈরী হয়নি কেন? আমি অভুক্ত থাকবো?'

মনের অবস্থা অনেক কষ্টে চেপে সুরজীত আস্তে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমায় খাবার তৈরী করে দিচ্ছি।' যখন সে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছে ঠিক তখনই পাপ্পী আবার উঠে কাঁদতে আরম্ভ করল। সে পাপ্পীর দিকে একবার তাকিয়ে মাহিন্দরের দিকে তাকাল। মাহিন্দর তখন একটা ম্যাগাজিনের পাতা দেখছিলেন। সুরজীত নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। রেগে বলল, 'দয়া করে বাচ্চাটাকে একটু কোলে নাও।'

মাহিন্দর সাধারণত পাপ্পীকে কোলে নিতেন না। উপরন্তু তাঁর খাবার তৈরী হয়নি বলে সুরজীতের উপর আরও এক ধাপ রেগে ছিলেন। কোন দিকে না তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'পাপ্পীকে নেওয়া আমার কাজ নয়।'

সাধারণত মাহিন্দরকে কিছু বললে যখন তিনি কড়া জবাব দিতেন, সুরজীত কিছু মনে করত না এবং হাসি মুখে সব সহ্য করতো। কিন্তু আজ মাহিন্দরের কথা তার মনে দারুণ আঘাত দিল। সে কিছু বলার আগেই চোখের জল দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। যে মানসিক কষ্ট এতক্ষণ সে চেপে রেখেছিল তা ঠেলে উঠল তার

কড়া জবাবে। 'যদি তুমি পাপ্পীকে নিতে না পার তবে তোমার খাবার রান্না করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

মাহিন্দর অবাক হয়ে সুরজীতের দিকে তাকালেন। কিন্তু সুরজিতের মুখ দিয়ে তখন কথা উপছে পড়তে লাগল, 'তোমরা, পুরুষরা মনে কর মেয়েরা বাড়িতে বসে শুধু খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। তাই তাদের সম্পর্কে বিবেচনার কোন প্রশ্নই আসে না। আমরাই জানি, বাড়ির সব দিক ঠিক ভাবে চালাবার জন্য সারাদিন কতটা পরিশ্রম করতে হয়। তুমি সারাদিনে ছঘণ্টা কাজ কর আর আমি ২৪ ঘণ্টা করি। এ সবের জন্য কী পাই আমি? আমার কাজ, কাজই নয়, শুধু মাত্র সময় কাটানো, তাই না? তুমি তোমাদের বড়কর্তার কাছে সহানুভূতি আশা কর কিন্তু আমার প্রতি কোনদিন কি সহানুভূতি দেখিয়েছো? ভগবানই জানেন কি হতো, আমি যদি ঠিক সময়ে না দেখতাম আর পাপ্পী যদি স্টোভের উপর পড়ত। ভাবতেও শরীর হিম হয়ে যায়। ওকে টেনে নিতে গিয়েই তো আমার কনুই লেগে সব্জির কড়াটা পড়ে গেল। আমার শাড়িতে গরম তরকারির ঝোল লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। পাপ্পীর কয়েক জায়গায় পুড়ে গেছে। তখন আমার অবস্থা কি হয়েছিল তুমি তার কতটুকু জানো। পাপ্পী তখন থেকেই কাঁদছে·······'

মাহিন্দর ভয় পেয়ে পাপ্পীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তার হাতের কয়েক জাগায় কালির দাগ রয়েছে। ঐ দাগ দেখে মাহিন্দর রেগে উঠে বললেন, 'আমি বহুবার তোমাকে একটা চাকর রাখতে বলেছি। কিন্তু তুমি কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। এখন বোঝ কি অবস্থা।'

'আমার কি চাকর রাখতে অনিচ্ছা? কিন্তু চাকরের মাইনের যে পয়সাটা আমি বাঁচাই সে কি নিজের জন্যে খরচ করি? যদি দুর্দিনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করে না রাখি তবে তোমার বাবা-মা তো আমাকেই দায়ী করবেন, তোমাকে নয়।' সুরজীত এক নিশ্বাসে বলে গেল।

সুরজীত ইতিমধ্যে পাপ্পীকে কোলে তুলে নিয়ে, কাঁধে ফেলে চাপড়াচ্ছিল। এখন দেখল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঁধ থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সে আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

মাহিন্দর একা ম্যাগাজিন নিয়ে বসে রইলেন। চোখ যদিও পাতার উপর নিবদ্ধ কিন্তু তিনি তখন অন্য কথা চিন্তা করছিলেন। তাদের চার বছরের বিবাহিত জীবনে কখনো সুরজীতের এ রকম ব্যবহার করেনি। সুরজীতের আজকের মেজাজ মাহিন্দরের মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। কলেজের কাজ ছাড়া ঘরের কাজের ব্যাপারে তাঁর কি কোন দায়িত্ব নেই?·······সুরজীত

ঠিক বলেছে। তাঁর কাজের ঘণ্টা বাঁধা কিন্তু সুরজীত অবিশ্রান্ত ভাবে সারাদিন খেটে চলেছে। তার হপ্তায় একদিন ছুটি, সেদিন তিনি শুয়ে বসে কাটিয়ে দেন। পুরুষরা সত্যিই কী স্বার্থপর! অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও সব সময় নিজেরা ব্যস্ত থাকে। স্ত্রী সম্পর্কে কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করে না তারা। হাঁড়ি নিয়ে কলঘরে যেতেন। রবিবার সকালের এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আজও হলো না। কিন্তু যখন চুল তাঁর শুকিয়ে গেল, তিনি নিজেই মাথায় তেল ঘষতে লাগলেন। সুরজীত তখন পাপ্পীকে স্নান করাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। পাপ্পীকে স্নান করিয়ে সুরজীত কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখল, মাহিন্দর তাঁর তালুতে তেল ঘষা শেষ করে মাথার চুল বাঁধছেন।

সুরজীতের মনে হলো মাহিন্দর নীরবে তার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তাদের বিয়ের পর এমন একটা রবিবার সে মনে করতে পারল না যেদিন তার স্বামী চুলে তেল মাখিয়ে দেবার জন্যে তাকে ডাকেন নি! এটাকে সে তার নিজস্ব অধিকার বলে ভাবত! তার অন্য যে কোন চাহিদাকে সুরজীত উপেক্ষা করতে পারত কিন্তু এই তুচ্ছ কাজটুকুর মধ্যে সে যে মাহিন্দরকে একান্ত ভাবে কাছে পাওয়ার স্পর্শ সুখ অনুভব করত। কিন্তু আজ তিনি নিজেই চুলে তেল মেখেছেন। সুরজীতকে আভাসেও কিছু বলেন নি। দুরন্ত অভিমান বুকে চেপে সব কিছু সুরজীত নীরবে লক্ষ্য করে গেল। একটা কথাও বলতে পারল না।

পরের দিন সকালে যখন মাহিন্দর স্নান করতে যাচ্ছেন তখন সুরজীত বলল, 'কাপড় চোপড়গুলো যেন কলঘরে রেখে যাওয়া হয়—পরে ধুয়ে দেব।'

'না-না, তার দরকার কি—ওসব আমিই করে নেব। এমন কিছু অসুবিধে হবে না।' মাহিন্দর উত্তর দিলেন। সেদিন তিনি শুধু গেঞ্জি, জাঙ্গিয়াই কাচলেন না, উপরন্তু দাড়িতে বাঁধার কাপড়ও ধুয়ে দিলেন।

মাহিন্দর যতই তাঁর ব্যক্তিগত কথা ভাবুন, যতক্ষণ না সুরজীত খেতে ডাকল মাহিন্দর ততক্ষণ এইসব আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। আর সেই রাত থেকেই মাহিন্দরের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এল। পরের দিন ভোর বেলায় তিনি কুঁজোর কাছে গিয়ে নিজের জন্য এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিলেন। নিজের মোজা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া কেচে ফেললেন। জুতোয় রঙ লাগালেন। কলেজ থেকে ফেরার পর বিছানায় কোট এবং টাই ছুঁড়ে ফেলা বন্ধ করে দিলেন। সব জিনিস হ্যাঙ্গারে ভাল ভাবে টাঙিয়ে রাখতে লাগলেন! সন্ধ্যেবেলায় তাঁর স্ত্রী যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকত, তখন পাপ্পীকে নিয়ে বারান্দায় ঘুরে বেড়াতেন।

মাহিন্দরের এই পরিবর্তন কি ভাবে গ্রহণ করবে সুরজীত বুঝতে পারছিল

না। প্রথমে সে চুপ করে ছিল। তারপর একদিন ছোটখাট জিনিসের জন্য ওকে মাথা ঘামাতে বারণ করল। উত্তরে মাহিন্দর বললেন, 'এবার থেকে আমি নিজের জিনিস নিজেই দেখব। বাড়ির অন্যান্য কাজের জন্যে যদি দরকার হয় তবে তাতেও সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।'

'থাক থাক, সে সব তোমার দ্বারা হবে না।' সুরজীত হেসে বলল।

'দেখই না হয় কি না।' মাহিন্দর গম্ভীর স্বরে বললেন।

'বেশ তাহলে তো খুব ভাল হয়।' সুরজীতের কণ্ঠে যেন পরাজয়ের মনোভাব ফুটে উঠল।

সেদিন রবিবার, ছুটির দিন। এইদিন মাহিন্দর চুল পরিষ্কার করেন। ভোর বেলা থেকেই সুরজীত তাঁকে সেকথা মনে করিয়ে দিত। কিন্তু মাহিন্দরের সে ব্যাপারে কোন তাড়া থাকত না। সকালে চা খাওয়ার পর, কাগজ পড়ে কিছু সময় নষ্ট করতেন। তারপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করতেন। যখক সুরজীত রেগে আগুন হয়ে উঠত তখন সাবানের বাক্স, তোয়ালে এবং টুকিটাকি কাজগুলো যতবেশি নিজে সেরে নিতে লাগলেন, সুরজীতের মনে ততই অভিমান দানা বাঁধতে লাগল। তার মনে হলো একান্ত নিজস্ব কোন সম্পদ সে হারাতে বসেছে। আগে ছোট খাট চাহিদার জন্য মাহিন্দরের উপর সে বিরক্ত হত। আর এখন মাহিন্দর যদি কোন প্রয়োজনে ডাকে সেই আশায় সে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। নিজের কাপড় পরিষ্কার করা ছাড়া মাহিন্দর নিজের রুমালও কাচতে শুরু করে দিলেন। প্রতিদিন পছন্দ করে নিজেই টাই বের করে নিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় পাপ্পাকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে বেড়াতে ভুলতেন না। ঘরের মধ্যে শুধু একটা জমাট শূন্যতা ধোঁয়ার মত ভরে থাকত। যখন তখন কোন কিছু খুঁজে না পেয়ে স্বামীর অধীর চিৎকার আর শুনতে পাওয়া যেত না। বাতাসের বেগে কাজ করে চলার প্রয়োজন সুরজীতের ফুরিয়ে গেছে।

আর এক রবিবার ঘুরে এল। মাহিন্দর বারান্দাতে বসে তাঁর চুল শুকোচ্ছিলেন, এমন সময় পাপ্পীর কান্না শুনে ভিতরে এলেন। 'কি ব্যাপার?' মাহিন্দর জিজ্ঞাসু চোখে সুরজীতের দিকে তাকালেন।

'ওকে না হয় আমার কাছে দাও—একটু ঘুরিয়ে আনি।'

'না না, আমার কাছে থাক। ওকে দুধ খাওয়াতে হবে।' সুরজীত ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল।

মাহিন্দর আবার বাইরে চলে গেলেন। আর যখন তাঁর চুল শুকিয়ে গেল তিনি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। আলমারি থেকে তেলের বোতলটা বের করে

চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে বোতলের ছিপিটা খুললেন।

সুরজীত সব লক্ষ্য করছিল। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে উঠে মাহিন্দরের হাত থেকে বোতলটা ছিনেয়ে নিল।

'আমি মাখিয়ে দিচ্ছি?' সে বলল।

'না না, আমি নিজেই এ-সব করতে পারি।'

'না, আমিই সব করে দেব।'

'সত্যি বলতে কি তোমার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই.......' মাহিন্দর বোতলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু সুরজীত বেশ শক্ত করে ধরে ছিল। মাহিন্দর অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। তারপর বোতলটা আস্তে আস্তে সুরজীতের হাতে ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণের জন্যে সুরজীতও অনিমেষ দৃষ্টিতে মাহিন্দরের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ তার দুচোখ জলে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে বলে উঠল, 'কেন তুমি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে—কেন, কেন?'

'আরে ব্যাপারটা কি?' থতমত খেয়ে মাহিন্দর বললেন।

'কিছু না।' সুরজীত আবার নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল। সে চোখের জল মুছল। তারপর কান্না ভেজা গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার চুলে আমি তেল ঘষে দিচ্ছি।'

মাহিন্দরের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। তারপর তেল মালিশ করার জন্য মাথাটা এগিয়ে দিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, 'স্বয়ং ভগবানও মেয়েদের মনের রহস্যের তল খুঁজে পান না, আমি তো কোন ছার।'

অন্তরালে

যশপলা

চৌধুরী পীরবক্সের ঠাকুরদা দারোগা ছিলেন। রোজগার করতেন ভালোই, চাকুরি জীবনেই ছোট্ট একটি পাকাবাড়ী তৈরী করে নেন। দু'টি ছেলেকেই ম্যাট্রিক পাস করিয়ে একজনকে রেলের, অন্যকে ডাকঘরের কাজ পাইয়ে দিলেন। ছেলেদের বিয়ে-থা হলো, নাতি-পুতির মুখ দেখার সৌভাগ্যও বাদ পড়লো না। কিন্তু চাকুরিতে ছেলেরা তেমন সুবিধে করতে পারলো না। ভবিষ্যতের আশা নিয়েই তাঁকে চোখ বুজতে হলো।

বাড়িটা ছোট্ট হলেও বংশমর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে চৌধুরী ওটাকেই 'বড়বাড়ি' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে মেয়েরা থাকতো বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে। পুরুষেরা আড্ডা জমাতো রাস্তার ধারের বৈঠকখানায়। নামকরণ গালভরা হলেও বাজে বৈঠকীতেই দিন গুজরান হতো তাদের। কাজেই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর ক্রমবর্ধমান সংসারের স্থান সংকুলানের জন্য সদর দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে বৈঠকখানাটাকেও অন্দরের সামিল করে নিতে হলো। বৈঠকখানা না থাকলেও ঠাট বজায় রাখার দারুন প্রয়াস!

ক্রমে স্থানাভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দিলো। সুতরাং সুবিধামত এদিক ওদিক ছড়িয়ে না পড়ে আর উপায় রইল না।

চৌধুরী সাহেবের ছোট ছেলে ইলাহী বক্সের চারটি ছেলের মধ্যে তিনটি মোটামুটি লেখাপড়া শিখে নিজেদের পছন্দসই কাজকর্ম জুটিয়ে নিলো। ছোট ছেলে পীরবক্স কিন্তু প্রাইমারীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলো না। তাহলেও ইতিমধ্যে তার বিয়ে দিয়েছিলো। এবং শীগগিরই মা ষষ্ঠীর কৃপায় বা আল্লার দোয়ায় অনেকগুলি রেজগীতে ভরে উঠলো ঘর। বংশমর্যাদার উপযুক্ত উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে হলো। মর্যাদা মাফিক কাজ যখন জুটলো না তখন অগত্য একটা-কলের চাকুরিতেই যোগ দিতে হলো। একাজের উপযুক্ত সে ছিলো না, তবু বংশমর্যাদার তকমাটার জোর ছিলো, তাই মজুরিগিরির বদলে কলম পেষার কাজই জুটলো। মুন্সিগিরি। মাইনে মাসে বারো টাকা।

আয়ের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা স্যাঁত স্যাঁতে বস্তিতেই তাকে ঘর

নতে ছিলো। ভাড়া মাসে দুটাকা। আশে পাশে মুচি, মেথর, কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরা ঘাঁটা লোকদের বাস। সামনেই রমজানী ধোপানী। ভাঁটিখানার ধোঁয়ায় জায়গাটা অন্ধকার হয়ে থাকে। সোডার গন্ধে ঘরে টেকা দায়। গলিটার মুখেই জলের কল থেকে চুঁইয়ে পড়া জলধারা কাঁচা গলিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে বরাবর কালো হয়ে সর্বক্ষণ বয়ে যায়। তারই দুপাশ দিয়ে ঘাস গজিয়ে উঠেছে পুরু হয়ে। রাজ্যের মশা আর মাছির ভনভন আওয়াজ সর্বক্ষণ আলোবাতাসহীন গলিটার মিশকালো অন্ধকারকে জড়িয়ে থাকে।

বস্তিতে পীরবক্সের মত লোকেরও লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি ছিলো। আর তার একমাত্র নিদর্শন ছিলো দরজায় ঝোলানো দামী পর্দাটা। বাড়ির ভেতরে যাই ঘটুক না কেন, শত তাপ্পি দেওয়া দামী পর্দা যেমনকার তেমনি ঝুলতো। বস্তির লোকদের কাছে পীরবক্স তাই ছিল চৌধুরী সাহেব বা মুন্সিজী। তার বাড়ির মেয়েরা ছিল অসূর্যম্পশ্যা—কেউ কোনদিন তাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেনি।

দিন কেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু সময়ের গুণে দেউড়ির নড়বড়ে দরজাটা খসতে খসতে একদিন রাত্রে একেবারে ভেঙে পড়ে গেলো।

পীরবক্স নিজেই সে রাত্রে কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু সারারাত্রি ভয়ে তাকে ভয়ে কাটলো—কি জানি যদি চোর আসে! কিন্তু চোর এলো না। বাইরের লোকে অবস্থাপন্ন জানলেও চোরের নেবার মত কিছুই পীরবক্সের বাড়িতে ছিলো না।

অবশ্য চোরের চেয়ে পর্দার সমস্যাটাই ছিল বেশি। কারণ—দরজা না থাকলে পর্দা টাঙানো ছাড়া অন্য পথ নেই। কিন্তু পুরনো জীর্ণ পর্দাটা একদিন ঝড়ের রাত্রে এমনি ফালা ফালা হয়ে গেলো যে খাটাবার আর উপায় রইলো না। বাধ্য হয়ে ঘরের শেষ সম্বল দামী শতরঞ্চিটাই টাঙিয়ে দিতে হলো।

পাড়ার লোকে দেখে বলল, 'চৌধুরী সাহেব, এমন দামী জিনিস আজ কালকার দিনে কেউ নষ্ট করে? সস্তা চাদর ঝুলিয়ে দিন না!'

পীরবক্সের জানা ছিল আট আনার কমে দু গজ কাপড় পাওয়া শক্ত। হেসে বললে, 'তাতে আর হয়েছে কি। আমাদের বড় বাড়িতে তো এই ধরনের পর্দাই বরাবর খাটানো হয়।'

পনেরো বছরে পীরবক্সের মাইনে বারো থেকে বেড়ে হলো আঠারো টাকা। কিন্তু আল্লার কৃপায় সন্তান হলো ছেলে মেয়ে মিলিয়ে প্রায় আধ ডজন। তার উপর পিতার মৃত্যুর পর ভাইরা কেউ দায়িত্ব না নেওয়ায় মা তারই কাছে পড়ে রইলেন।

সংসারে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এবং অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। বাড়ির পাঁচজন মেয়েমানুষের কাপড় জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে গা থেকে খসে খসে পড়ে, পীরবক্স নিজের পায়জামা আর পাঞ্জাবিও শালীনতা রক্ষা করে চলার অনুপযুক্ত। কিন্তু কোনক্রমেই কোনো কিনারা সে করে উঠতে পারলো না। চারদিকে অকূল পাথার। কারখানা থেকে সাত তারিখের আগে বেতন মিলবে না। এডভান্স মালিক দিতে নারাজ। জিনিস বন্ধক দিয়ে টাকায় বারো আনা সুদে ধার কখনও কখনো সে নিয়েছে। কিন্তু আবার উপায় ছিলোনা। কাজেই কাবুলীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথই বা কি! বাবর খাঁর কাছে থেকে আগেও দু একবার সে টাকা ধার নিয়েছে। এবারেও তারই কাছে ধর্ণা দিতে হলো। মাসিক টাকায় চার আনা সুদে চার টাকা ধার নিলো। আট মাসে ঋণ পরিশোধ করার চুক্তি হলো।

বাবর খাঁয়ের সুদ মেটাতে না পারলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করে পীরবক্সের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সাতটি মাস মরি-বাঁচি করে সে সুদ শোধ করলো। কিন্তু শ্রাবণের ভরা বর্ষায় গমতো দূরের কথা বজরাও যখন টাকায় তিনসের হলো তখন আবার ধার না করে পেরে উঠলো না। খাঁ সাহেবের, হাতে পায়ে ধরে, দেড়া সুদ দিতে রাজী হয়ে আরো এক মাস সময় নিলো। কিন্তু ভাদ্র মাসে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠলো।

মাগগি ভাতা নিয়ে বিশ টাকা বেতনের মধ্যে অগ্রিম নেওয়ার দরুন সেদিন মাত্র চারটি টাকা তার হাতে এসেছে। এদিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, তার পথ্য পর্যন্ত জুটছে না; ছেলে মেয়েগুলো সারা হপ্তাটা প্রায় উপোস দিয়েই কাটিয়েছে। কোনদিন দুচার পয়সার সস্তা খাবার, নয়তো এক বাটি করে বজরা সেদ্ধ খেয়ে গুষ্টিসুদ্ধ কাটাতে হয়েছে। এত কষ্ট করে চার টাকা থেকে দেড় টাকা কেটে বাবর খাঁয়ের হাতে তুলে দেওয়া পীরবক্সের পক্ষে সম্ভব হলো না।

কাজেই পীরবক্সের কাছে বাবর খাঁ একটা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রইলো। ওর কথা মনে হলেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

'চৌধুরী!' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলো পীরবক্স। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো গলাটা, হাত পাগুলো এলিয়ে পড়লো। কিন্তু গলা চড়িয়ে চৌদ্দপুরুষের নাম ধরে যখন গালাগালি করতে করতে পর্দা ঠেলাঠেলি শুরু করলো বাবর খাঁ, নির্জীবতা সত্ত্বেও তখন বেরিয়ে এসে সে তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। মুহূর্তের জন্য তার অভিজাত রক্ত গরম হয়ে উঠে তখনই আবার শান্ত হয়ে গেলো। খাঁয়ের পা ধরে সেদিনকার মত মাপ চাইলো।

ক্রুদ্ধ বাবর খাঁ তখন অগ্নিশর্মা। তার চিৎকারে চৌধুরীর দরজার সামনের

বস্তির যত মুচি আর মজুরদের ভীড় জমে গেলো। উত্তেজিত ভাবে লাঠি ঠুকে বাবর চিৎকার করে বলল, 'টাকা দিতে পারবিনা তো কেন নিয়েছিলি বদমাস্? তোর মাইনের টাকা কি করেছিস? বদমাস্, আমার পয়সা মারবি....আজ তোর চামড়া না ছাড়িয়ে নিয়েছি তো....পয়সা নেই, আবার পর্দা, নবাবী চাল মারিস। দে, তোর বউয়ের গয়না খুলে দে, শুধু হাতে আজ কিছুতেই ফিরবো না।'

নিরুপায় এবং হতবুদ্ধি পীরবক্স দু হাত তুলে বাবর খাঁয়ের কল্যাণ কামনা করে বললো, 'শপথ করছি, বিশ্বাস কর, ঘরে একটা কানা কড়িও নেই, বাসনপত্র, কাপড় চোপড় কিচ্ছু নেই। এরপরেও যদি চাও আমার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।'

বাবর খাঁ জলে উঠলো, 'রেখে দে তোর শপথ, ওতে কাজ নেই। তোর চামড়াই বা আমার কি কাজে লাগবে, ওতে তো জুতোও বানানো যাবে না?'

'তোর চামড়ার চেয়ে এই পর্দাটারও দাম বেশি।' বলতে বলতেই টাঙানো পর্দাটা বাবর খাঁ এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো। পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী কাটা গাছের মত সংজ্ঞাহীন হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পর্দাহীন দরজার ভিতর দিয়ে তাকাবার মত মনোবল কারও ছিলো না। এ পাশে সংঘটিত ঘটনার উত্তেজনা ও আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মেয়েরা উঠোনের মাঝখানে জড়ো হয়ে বলির পাঁঠার মত থরথর করে কাঁপছিলো। সহসা পর্দাটা ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তারা এমন সংকুচিত হয়ে উঠলো যে দরজার মুখে ভীড় করে দাঁড়ানো জনতার মনে হলো তাদের পরনের শাড়ি কাপড়গুলো কে যেন অকস্মাৎ তাদের গা থেকে একটানে ছিনিয়ে নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে পর্দাটাই ছিলো বাড়ির মেয়েদের আবরু। পর্দা না থাকলে তারা প্রায় উলঙ্গ!

জটলা পাকিয়ে থাকা আশেপাশের মুচি, মেথর, ধোপা, কুলি প্রভৃতি সমাজের নোংরা-ঘাঁটা, লেখাপড়া-না-জানা, লোকগুলো ঘৃণা আর লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। হঠাৎ ঐ নগ্ন চেহারাগুলো বাবর খাঁয়ের কঠোরতাকে পর্যন্ত চাবুক মারলো। ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে থু থু করে পর্দাটা উঠোনের দিকে ছুঁড়ে ফেলল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে ভীড়ের সামনে থেকে আড়ালে মেয়েদের ছুটে পালাতে দেখে লজ্জা আর কেমন যেন এক অব্যক্ত করুণায় জনতা ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো। চৌধুরী বেহুঁস হয়ে পড়েই রইলো, যেন ঘুমুচ্ছে। যখন তার হুঁস হলো তখন দেখলো পর্দাটা তারই সামনে উঠোনের উপর গুটিয়ে জড়পিণ্ডের মত পড়ে রয়েছে। কিন্তু উঠে টাঙিয়ে দেবার মত উদ্যম তার শরীরে ছিল না। তার প্রয়োজনও আর ছিলো না। যে ভুয়া আভিজাত্যকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রেখেছিল ঐ পর্দা, এখন তার মৃত্যু ঘটেছে।

নামের বহর

রাজকমল

'নামের কী বহর। একেবারে সতী। সীতা সাবিত্রীর মতই যেন সতী। কতই না পতিব্রতা। কি হে ললিত কেমন দেখছ ওকে?' রঙের গোলাম ফেলতে ফেলতে রামু বলে।

'কাজ করার ঢং দেখ। নিজের গতর খাটিয়ে স্বামীকে খাওয়াচ্ছে। সমাজের ভয় নেই। ধর্মের দিকেও কোন খেয়াল নেই। দিনরাত গাঁয়ের ভবঘুরে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' গোলামের উপর টেক্কা ফেলতে ফেলতে মহেশ কাকা বললেন।

মহেশ কাকার পাতকুয়ার কাছে তাসের আসর বসেছিল। আমি ছিলাম আর ছিলেন গাঁয়ের একমাত্র হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ললিত ঠাকুর, শিবদন পালোয়ানের ছেলে রামু আর মহেশ কাকা—গাঁয়ের চাণক্য বা শকুনি।

আর রতন ধানুকের নববিবাহিতা পত্নী সতী পাতকুয়ার জল টেনে তুলছে খুশী খুশী মনে। শীলের মতন চিকন শরীর, দুধে আলতা গোলা গায়ের রং, সারা অঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বাস আর মিথিলার রমণীদের মত সুদীর্ঘ নাসিকা। সে চাঁদ না হোক, প্রায় শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের জলে পড়া চাঁদের প্রতিবিম্ব নিশ্চয়।

কলসীর মত অঙ্গভঙ্গী করে জলভরা কলসী কোমরে রেখে তাসের আসরের কাছে এসে ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে বলে, 'বাবু আপনাদেরও রঙ-ঢং করার ইচ্ছে করছে নাকি!'

এই কথা বলে খিল খিল করা হাসির আবির ছড়াতে ছড়াতে বার বার ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে তার ঘরের দিকের গলিতে ঢুকে পড়ে।

মহেশ কাকা চটে গিয়ে বলেন, 'শুনলে তো সতীর কথা, বলি চোরের মায়ের বড় গলা কি আর এমনি এমনি লোকে বলে।'

তাসের আসর ভেঙ্গে গেল, কিন্তু আমার মনে তাসের বিবি, না না, রতন ধানুকের বউ দোলা দিতে থাকে। আমিও ঐ গাঁয়েরই যুবক, চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘে চাষের জমি আছে, মনে রঙ আছে, তৃষ্ণাও কম নেই।

বউ ছিল বাপের বাড়িতে। রান্না, বাসন মাজা—সব বিধবা বউদি করত।

সন্ধ্যার দিকে বেরিয়ে এসে বললাম, 'বউদি, বাসন মাজা জল তোলার জন্য একটি ঝি রাখলেই ত হয়।' বউদিও যেন ঠিক এটাই চাইছিল। রাজী হয়ে গেল। দিন চারেক পরেই সতীকে রাখা হল, ঐ সব কাজ করার জন্য। বউদি বলল, 'চন্দ্রমুখী (আমার বউ) যাওয়ার পর থেকে পূজোর পাঠ যেন উঠে গেছে। সতীকে রাখায় আমি ঐ দিকটা দেখতে পারবো।'

ওর কথার পিঠেই সতী বলে, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি সব কাজ সামলে নেব। বাবুর কোন দিক দিয়ে অসুবিধা যাতে না হয় তা দেখব।'

আমি বললাম, 'কি মুখরা তুমি, কথা বলার সময় কিছুই খেয়াল থাকেনা। যা মুখে আসে তাই বলে দাও। এখন বউদি কি ভাববে বল দেখি?'

বউদি ঘোমটা আর একটু বেশি করে টেনে নিয়ে পাতকুয়ার দিকে চলে যায়। আর মুচকি হেসে সতী আঙ্গিনায় ঝাঁট দিতে থাকে।

এই ভাবে চার দিন কেটে গেল। বউদি পূজো আচ্চা আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত। সতী ব্যস্ত তার জল তোলা ও বাসন মাজার কাজে। এসব কাজ করার সময় তার গায়ের কাপড়টা প্রায় খসে খসে পড়ত, সে আবার তুলে নিত। তার অঙ্গভঙ্গী, হাসি, ইঙ্গিতপূর্ণ কথা কার না মনে দোলা দেয়।

সেদিন বউদি মহেশ কাকার ওখানে কি এক কাজে গিয়েছিল। ফিরতে বেশ দেরি হবে।

বর্ষার সন্ধ্যা। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। আমার মনেও কালো মেঘ জমেছে। সতী রান্নাঘরের উনান ধরানোর যোগাড়যন্ত্র করছে।

আমিও রান্না ঘরে ঢুকলাম। সে একটু হেসে বলল, 'বাবু, আমি এই গাঁয়েরই ছেলের বউ শুধু নই, এই গাঁয়েরই মেয়ে। এমনিতে তো আমরা সকলেরই বউদি হই কিন্তু এই গাঁয়েরই মেয়ে হিসাবে আমি আপনার বোনও তো হই। যাক সে কথা, এখন খুলে বলুন দেখি, কি চান আপনি?' রাগ হল না। আশ্চর্য লাগল। অতীতে শোনা কথা মনে পড়ল সব। ললিত বলেছিল, 'আরে রাখ তোর সতী। আটগণ্ডা পয়সা দে........ব্যাস।'

রামু বলেছিল, 'আরে এই তো সেদিন দেখলাম সতী আর মহেশ কাকাকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে।'

মহেশ কাকা বলেছিল, 'কি করবে বেচারী রতন তো ঘরে এক পয়সাও আনে না। দিনরাত তাড়ি খায় আর ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়।'

আরে আজ........ঘরে কেউ নেই। স্যাঁত সেঁতে অন্ধকারে বসে আবার বলছে, 'এ দেহটা তো রতনেরই।'

কোন কথা বলতে পারলাম না। আস্তে আস্তে সরে গেলাম। এই ঘটনার পর দিন কয়েক কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন শুনি রতন এক মাঝির মেয়েকে নিয়ে কলকাতা পালিয়েছে। খুব খুশী হলাম। দেখি সতী কি করে।

সন্ধ্যার সময় নিজের কাজ করতে সতী আসে। নিঃসঙ্কোচে বলে, 'বাবু আমার রতন জয়মঙ্গল মাঝির মেয়েকে নিয়ে ভেগেছে।' বলেই হি-হি করে হেসে উঠল।

বউদি পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তুই কি নির্লজ্জ রে সতী! স্বামী পালিয়ে গেছে, আর সেই কথাটা অমন দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলছিস।'

সতী চুপ করে হারিকেনের চিমনি মুছতে থাকে। কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে আমার ঘরে ঢোকে। আমি বললাম, 'এখন কি ভাবছ সতী। তোমার এই শরীরের মালিক তো ভেগেছে।'

চায়ের গ্লাস হাতে দিতে দিতে বলল, 'ঐ মাঝির মেয়েটা কি আর রোজগার করে খাওয়াতে পারবে? তার কাপড়, জামা, প্রত্যেক দিন তাকে তাড়ি খাওয়ার জন্য চার আনা আট আনা করে দিতে পারবে? দেখবেন আপনি, দিন সাতেক যেতেই আট দিনের মাথায় রতন ফিরে এসে আমার পায়ে গড়াগড়ি খাবে।'

অপূর্ব এক গর্বে তার টানা-টানা চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার গর্ব—শ্রমের গর্ব। সর্বহারাদের আত্মবিশ্বাসের গর্ব!........কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ ছলছল করে ওঠে। মেঝেতে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, 'কিন্তু বাবু আটদিন পর্যন্ত কি আমি আর এই দেহটাকে সামাল দিয়ে রাখতে পারব! পারব কি? হয়তো পারবোনা। সারা গাঁয়ে রাক্ষসদের আড্ডা জমেছে! কি বলব বাবু, গাঁয়ের বড় বড় লোকের ছেলেরা সারারাত দরজায় টুকটাক আওয়াজ করে। তাদের ঐ ভয়ঙ্কর আওয়াজে হয়তো একদিন না একদিন আমার দরজা ভেঙ্গে যাবে। তখন কি আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব........। আজ সকালে পাত-কূয়ার জল আনতে গেছি, আর আপনাদের ঐ রামবাবু আমার আঁচল ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছিল। আজ যদি গাঁয়ে আমার রতন থাকত, মারের চোটে ওর ভূত ভাগিয়ে দিত। ওর লাশ পড়ে থাকত পাতকূয়ার ভিতরে।'

কিন্তু রতন যে মাঝির মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় ভেগেছে। সারা গাঁয়ের রাক্ষসরা সতীকে পাওয়ার জন্য ফন্দিফিকিরে আছে। রাবণের রাজ্যে সতী!

নিরীহ প্রাণী

প্রেমচন্দ

আপিসের কেরাণী অবলা প্রাণী বিশেষ। শ্রমিককে ভ্রুকুটি করলে সেও পাল্টা ভ্রুকুটি করে, কুলিকে গালাগালি করলে সে বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ভিখারীকে অপমান করলে প্রত্যুত্তরে সে দুচার কথা শোনায়, এমন কি গাধার মত বোকা জানোয়ারকেও যদি বেশিক্ষণ বিরক্ত করা হয় তাহলে সেও কিন্তু পেছনের পা ছোঁড়ে। কিন্তু কিছুই করে না শুধু আপিসের কেরাণী। তাকে ভ্রুকুটি কর, ধমকাও, অপমান কর, এমন কি মার ধোরও কর, সে কিন্তু সব কিছু নীরবে সহ্য করবে। দীর্ঘ দিনের তিতিক্ষা এবং তপস্যায় এমন কি যোগীরাও যেখানে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পারে না সেখানে সে তার ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ ভাবে তার নিয়ন্ত্রাধীনে এনেছে। সে আনন্দের প্রতিচ্ছবি, স্থৈর্যের প্রতীক, আনুগত্যের প্রতিমূর্তি, এবং বিনয়ের অবতার। সমস্ত গুণেরই অধিকারী সে। তা সত্ত্বেও ভাগ্যদেবী কিন্তু তার প্রতি কখনই সুপ্রসন্ন নয়। এমন কি নিঃস্ব যে চাষী, তার জরাজীর্ণ কুঁড়েরও কখন-সখনও চেহারা বদলায়। দেয়ালীর রাতে সেও তার কুঁড়ে ঘর প্রদীপের আলো দিয়ে সাজায়। বর্ষা সমাগমে সে উৎফুল্ল হয়, ঋতু পরিবর্তন দেখে সে আনন্দ উপভোগ করে।

কিন্তু কেরাণী বাবুর জীবনে এক ঘেয়েমি থেকে কোন মুক্তি নেই। তার জীবনে এই যে জমাট অন্ধকার, সেখানে কোন সময়েই আলোর রেখা এসে পড়ে না। তার চোখে মুখে কখনই হাসি ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় না। লালা ফতে চাঁদ মূক মনুষ্যত্বের এক উদাহরণ স্বরূপ।

কথায় বলে নামের মাধ্যমে চরিত্রের কিছুটা প্রতিফলন ঘটে। এখানে ফতে চাঁদ কথার অর্থ 'চন্দ্রবিজয়' কিন্তু আমাদের নায়ককে 'পরাজয়ের' দাস বলে অভিহিত করলেই বোধ হয় সমীচীন হয়। তার আপিসে ব্যর্থতা, পারিবারিক জীবনে ব্যর্থতা, বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা, পরাজয় আর হতাশার গ্লানি চারদিক থেকে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তার কোন ছেলে নেই, শুধু তিনটি মেয়ে। কোন ভাই নেই, আছে মাত্র দুটি শ্যালিকা। তারা কপর্দক শূন্য। তাই তারা তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেও পারে না। তার শরীরে দয়া মায়া খুব

বেশি। আর সে জন্যে প্রত্যেকেই তার সুযোগ নেয়। এ সব তো আছেই। তার ও'পরে তার স্বাস্থ্যও খুব খারাপ। বত্রিশ বছর বয়সেই মাথার চুলগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে। দীপ্তিহীন চোখ। হজম শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে মুখ, তোবড়ানো গাল। ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। মনে সাহস বলতে কিছুই নেই, রক্তেরও কোন জোর নেই। সকাল নটায় সে আপিসে যায় আর সন্ধ্যে ছটায় বাড়ি ফেরে। আপিস থেকে ফিরে তার আর এমন ক্ষমতা থাকে না যে সে একটু বাড়ির বাইরে যায়। বাড়ি আর আপিসের চার দেয়ালের বাইরে এই বিরাট দুনিয়ায় কি যে ঘটছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধ্যান ধারণাই নেই। আপিসই হচ্ছে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। আপিসই হচ্ছে তার স্বর্গ ও নরক। ধর্মকর্মে যেমন কোন উৎসাহ নেই তেমনি আনন্দ উপভোগেরও কোন উৎসাহ নেই। পাপ কর্মেও তাই। আগে সে তবু তাস খেলত। সেও তো আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা।

শীতকাল। আকাশে হাল্কা মেঘ। লালা ফতে চাঁদ বেলা সাড়ে পাঁচটায় আপিস থেকে বাড়ি ফিরে এল। এর মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হয়ে গেছে। প্রতিদিনের মত সেদিনও বাড়ি ফিরে সে অন্ধকার ঘরে খাটিয়াতে বিশ মিনিট চুপচাপ শুয়েছিল। গলা দিয়ে যাতে স্বর বের হয় তার জন্য সে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছিল। বাইরে যখন চিৎকার হচ্ছে তখনও সে শুয়ে। কোন একজন তার নাম ধরে বাইরে ডাকাডাকি করছে। তার ছোট মেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখতে গেল। দেখে এসে খবর দিল যে আপিসের পিয়ন তাকে ডাকছে। তার স্ত্রী সারদা তখন ছাই দিয়ে বাসন মাজছিল স্বামীকে জলখাবার দেবে বলে। মেয়েকে বলল, 'জিজ্ঞেস করতো কি জন্যে এসেছে। লোকটা এই মাত্র আপিস থেকে ফিরেছে এর মধ্যে আবার ডাকাডাকি কিসের বাবা?'

সংবাদ বাহক উত্তর দিল 'সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে। জরুরী প্রয়োজন।'

লালা ফতে চাঁদের তন্দ্রা ছুটে গেল। কোন ক্রমে ক্লান্ত মাথাটা খাটিয়া থেকে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে ডাকছে?'

'আপিসের চাপরাশি।' সারদা বলল।

'সাহেবের আবার কি দরকার পড়ল আমাকে?'

'আপনাকে নাকি সাহেবের জরুরী দরকার।' সে বলল।

'আর বাবা তোমার সাহেবই কি রকম লোক? মনে হয় যেন সব সময় তোমাকেই দরকার। সারাদিন এত খাটিয়েও কি তার হয় না? তাকে বলে দাও যে যেতে পারবে না। খারাপ হলে এই তো হবে যে তোমার এই সামান্য

চাকরিটা খেয়ে নেবে। নিকুগে যাক্।'

ফতে চাঁদ বিড় বিড় করে কি যেন মনে মনে বলল, 'সব কাজই তো শেষ করে এসেছি। কি জন্যে আবার ডেকে পাঠাল? ব্যাপারটা খুব মজার।'

বাইরে দাঁড়িয়েছিল চাপরাশি। চিৎকার করে তাকে বলল, 'এক্ষুনি আসছি।' তারপর যাওয়ার জন্য তৈরী হতে গেল।

'কিছু তো মুখে দিতে হবে। তোমার তো আবার চাপরাশির সঙ্গে একবার কথা বলা শুরু করলে জগতের আর সব কিছু ভুলে যাও।' সারদা বলল।

খানিকটা মসুর ডালের হালুয়া নিয়ে এল সারদা। ফতে চাঁদ বের হবার জন্যে উঠে পড়েছিল। জলখাবার দেখে সে আবার বসে পড়ল। ক্ষুধায় কাতর ফতে চাঁদ খাবারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেমেয়েদের জন্যে রেখেছ তো?'

সারদা রেগে সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে জবাব দিল যেন মনে হল সে আগে ভাগে এ প্রশ্নটা আশা করেছিল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! তারা তাদের ভাগটা খেয়েছে। এবার তুমি কিছুটা খেয়ে উদ্ধার কর।'

ঠিক সেই সময়ে তার ছোট মেয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। সারদা মেয়ের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে কি করছিস? যা বাইরে খেলগে যা।'

'বাচ্চাদের এ ভাবে ভয় দেখিও না।' ফতে চাঁদ বলল, আয় চুন্নি আয়, বোস এখানে। নে একটু নে।'

মায়ের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে দৌড়ে রাস্তায় চলে গেল চুন্নি।

সারদা বলল, 'এইটুকু তো জিনিস। এ থেকে আবার কাউকে ভাগ দেবার কি আছে? যদি দাও তাহলে আরও দুজনে ভাগ নেবার জন্যে বায়না ধরবে।'

সেই মুহূর্তে চাপরাশি বাইরে থেকে চিৎকার করে বলল, 'বাবুজী, খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ওকে কেন বলে দিচ্ছ না যে এত রাত্রে যেতে পারবে না!' সারদা বলল।

'কি করে বলি বল? তার ওপরেই আমার জীবিকা নির্ভর করছে যে।'

'তুমি তো মুখে রক্ত তুলে তার কাজ করে যাচ্ছ। একবারও কি আয়নায় তোমার মুখটা দেখেছ? দেখে মনে হচ্ছে যেন ছ মাসের রুগী।'

কয়েক চামচ হালুয়া মুখে পুরে ঢক্‌ঢক্ করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল। তার পর বেরিয়ে পড়ল। সারদার পানটা সেজে আনা পর্যন্তও সে অপেক্ষা করল না।

তাকে দেখে চাপরাশি বলল, 'বাবুজী বড্ড দেরি করে ফেললেন। এখন একটু পা চালিয়ে চলুন। তা না হলে সাহেব আপনাকে দেখা মাত্রই গালাগালি

দেবে।' ফতে চাঁদ কয়েক পা দৌড়ে যাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

'গালাগালি দিলে দিক।' সে বলল।

'দৌড়তে পারব না। সাহেব এখন কোথায়? আপিসে না বাংলোতে?'

চাপরাশি বলল, 'আপিসে থাকবে কেন? সে রাজা না ভাঁড়?'

চাপরাশি জোরে হাঁটে। আর ফতে চাঁদ হাঁটে ধীরে ধীরে। কিন্তু কি করে এ কথা স্বীকার করবে। তার কিছুটা গর্ব ছিল। তাই সে প্রথমে চাপরাশির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। পাঁজরে ব্যথা বোধ করতে লাগল। ভালভাবে নিশ্বাস নিতে পারছিল না। মাথা ঘুরতে লাগল। সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম বেরিয়ে শরীরটা নিথর হয়ে গেল। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল। চাপরাশি চিৎকার করে তাকে সাবধান করে বলল, 'বাবুজী, আর একটু জোরে পা চালান! খুব আস্তে হাঁটছেন।'

কথা বলতেও ফতে চাঁদের কষ্ট হচ্ছে। 'তুমি এগিয়ে বল, এক্ষুনি আসছি।'

রাস্তার ধারে একটা উঁচু জায়গা দেখে সে বসে পড়ল। হাত দুটোর মাঝে মাথাটা রেখে দীর্ঘ নিশ্বাস নিল। এ রকম দেখে চাপরাশি আর তাকে কিছু না বলে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল। শয়তানটা গিয়ে সাহেবকে কি সব বলবে এই ভয় করতে লাগল ফতে চাঁদের। জোর করে উঠে পড়ে আবার সে চলতে শুরু করল। তার তখন শরীরের এমন অবস্থা যে শিশুর ধাক্কাতেও সে ধরাশায়ী হয়ে পড়বে। হোঁচট খেতে খেতে কোনক্রমে সে সাহেবের বাংলোতে গিয়ে পৌছাল।

সাহেব তখন বারান্দাতে পায়চারি করছিল। বারে বারে গেটের দিকে তাকাচ্ছিল। কাউকে দেখতে না পেয়ে সে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিল। চাপরাশিকে দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়ে চাপরাশি উত্তর দিল, 'হুজুর, ফতে চাঁদ আসতে এত সময় নিল যে আমি আর তার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কি ভাবে সারা রাস্তা দৌড়ে এসেছি।'

'বাবু কি বলল?' ভাঙা ভাঙা হিন্দী ভাষায় সাহেব জিজ্ঞেস করল।

"উনি আসছেন। বাড়ি থেকে বেরতেই তো প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল।'

ঠিক সেই সময়ে ফতে চাঁদ বাংলোর প্রশস্ত চত্বরে প্রবেশ করে। সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়।

সাহেব চকিতে জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরি কেন?'

সাহেবের অভিব্যক্তি দেখে ফতে চাঁদের রক্ত হিম হয়ে যায়।

"হুজুর, মাত্র কিছুক্ষণ আগেই তো আমি আপিস থেকে বাড়ি ফিরেছি। যে

মাত্র চাপরাশি গিয়ে ডেকেছে সেইমাত্র বেরিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।'

'মিথ্যে কথা বলছ। এখানে আমি ঝাড়া একঘণ্টা অপেক্ষা করছি।'

'হুজুর, আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলছি না। অসুস্থ বলে অন্যদিনের তুলনায় হয়তো আজকে আসতে একটু বেশি দেরি হয়েছে। কিন্তু চাপরাশি ডাকা মাত্রই আমি বেরিয়ে পড়েছি।'

সাহেব হাতের বেতটা ঘোরাতে লাগল। স্পষ্টত সে তখন মদে চুর। চিৎকার করে উঠল, 'চুপ কর শূয়োর। এক ঘণ্টার ওপর এখানে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করছি। কান ধরে ক্ষমা চা এক্ষুনি।'

ফতে চাঁদ নিজেকে সংযত করে। মনে হল সে যেন রক্ত গিলে খাচ্ছে। সে বলল, 'হুজুর, আজ আপিসে দশ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেছি—কখনই আমি—'

'চুপ কর শুয়োর! কান ধর বলছি।'

'কোন অন্যায় তো আমি করিনি।'

উন্মত্ত সাহেব চাপরাশিকে আদেশ করল, 'ব্যাটার কান দুটো মুলে দেতো।'

নিচু স্বরে কিন্তু বেশ নির্ভয়ে চাপরাশি উত্তর দিল, 'হুজুর, উনিও আমার উপরওয়ালা। কেমন করে ওনার কানে হাত দেব?'

'কান মুলে দে, আমি বলছি। না করলে তোকেও কিন্তু পেটাবো।'

চাপরাশি উত্তর দেয়, 'আপিসে আমি কাজ করতে এসেছি মার খেতে আসিনি। আমারও মান-সম্মান আছে। হুজুর আমার চাকরি নিতে পারেন। আপনার সব আদেশ পালন করতে রাজী আছি। কিন্তু অপরের আত্ম সম্মানে আঘাত করতে পারব না। চাকরি তো আমার চিরজীবন থাকবে না। আর এই জন্যে আমি জগতের সবাইকে আমার শত্রু বানাতে চাই না।'

সাহেব রাগ সামলাতে পারল না। বেত হাতে চাপরাশির কাছে ছুটে গেল। চাপরাশি বেগতিক দেখে পালিয়ে গেল।

ফতে চাঁদ হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চাপরাশিকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে সাহেব ফতে চাঁদের দিকে এগিয়ে এল। তার কান দুটো কষে ধরে সাহেব নাড়াতে লাগল। শূয়োর কোথাকার। অবাধ্য কোথাকার। যাও, আপিসে গিয়ে ফাইল নিয়ে এস।'

কানে হাত বুলোতে বুলোতে ফতে চাঁদ জিজ্ঞেস করল 'কোন ফাইলটা আনবো স্যার?'

'কোন ফাইলটা—কোন ফাইলটা করে চেঁচাচ্ছ? তুমি কি কালা? আমি ফাইল চাই…ফাইল! শুনতে পাচ্ছ না?'

ফতে চাঁদ সাহস সঞ্চয় করে এবং কিছুটা বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞেস করল, 'কোন ফাইলটা দরকার ?'

ভেবে পেল না কি করবে সে। কিন্তু আর একবার প্রশ্ন করার মত তার সাহস ছিল না। একে বদ মেজাজ স্বভাবের সাহেব। তার ওপর ক্ষমতায় মত্ত। আর তার ওপর হুইস্কি গিলে মাতাল হয়েছে। কেউই বলতে পারে না এরপর কি করে বসবে সাহেব। সুতরাং সে ধীরে ধীরে অপিসের দিকে পা বাড়াল।

'দৌড়ে যাও।' সাহেব চেঁচিয়ে বলে।

'হুজুর। দৌড়ে যেতে পারব না।' কেরানীটি উত্তর দেয়।

'দিন দিন খুব অলস হয়ে যাচ্ছ ? কেমন করে দৌড়তে হয় বুঝিয়ে দিচ্ছি। দৌড়াও, দৌড়াবে না।' সে পিছন থেকে লাথি মারল।

ফতে চাঁদ আপিসের কেরানী হতে পারে কিন্তু সেওতো মানুষ। তার যদি এতটুকু শক্তি থাকতো তাহলে সে এ রকম একজন মাতালের হাতে এভাবে অপমান সহ্য করত না। কিন্তু বাধা দিতে যাওয়া তার কাছে নিরর্থক বলে মনে হল। ফটক দিয়ে বেরিয়ে সে রাস্তায় পড়ল।

ফতে চাঁদ আপিসে আর গেল না। কোন ফাইলটা যে সাহেব চায় তা ঠিক করে বলেনি। মদে এমন চুর হয়েছিল যে সম্ভবত ফাইলটার কথা মনে করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। ধীর পদক্ষেপে সে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল। কারণ এই ব্যথা এবং অযাচিত অপমান তার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছে। দৈহিক শক্তিতে সাহেব তার থেকে শক্তিশালী হলেও সে কি তার মনের ভাবটা অন্তত প্রকাশ করতে পারত না ? পায়ের জুতো খুলে কেন সাহেবের মুখে মারল না ?

কিন্তু তাতে কোন ফল হত না, সে ভাবল। সাহেব হয়তো গুলি করে মেরেই ফেলত তাকে। খুব জোর কয়েক মাসের জন্য তাকে হাল্কা ধরণের শাস্তি প্রদান করতে পারে। আর তার ফলে তার সমস্ত পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তার সন্তান সন্ততিদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। তারা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে রাস্তায়। হায়, কেন তার অবস্থা আর একটু ভাল হল না! সংসার প্রতিপালন করার মত যদি তার অর্থ থাকত তাহলে সে কখনই এরকম আচরণ বরদাস্ত করত না। বজ্জাতটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মরতেও সে ভয় পেত না। জীবনে আর তার কোন মোহ নেই। কোন আশা নেই, কোন আনন্দ নেই তার জীবনে। তাই এ সংসার ছেড়ে যেতেও তার কোন দুঃখ নেই। কেবল মাত্র তার স্ত্রী....তার সন্তানসন্ততি রাস্তায় চলতে চলতে এসব চিন্তা তার মাথায় একের পর এক ভীড় করে আসে। এতদিনে কেন সে তার স্বাস্থ্যের প্রতি এমন নির্মম ভাবে অবহেলা

করে এসেছ ? সব সময় ছোরা নিয়ে তার চলাফেরা করা উচিত ছিল। সাহেবের গালে চড় বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। হয়তো সাহেবের খানসামা, চাকর বাকররা তাকে মেরে অজ্ঞান করে দিত, এমন কি তার ফলে হয়তো তার মৃত্যুও ঘটতে পারত। তবু চারদিকে এটাতো রটতো যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজন রুখে দাঁড়িয়েছে। একদিন না একদিন তাকে মরতেই হবে, সেদিন তো আর সে তার পরিবারকে দেখতে পারবে না। এরকম মৃত্যু তবু সম্মানের। শেষের চিন্তাটায় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর বাংলোর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু তারপর আবার মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

খুব সম্ভব সাহেব এখন ক্লাবে চলে গেছে। আর ঝঞ্ঝাট ব্যাধিয়ে লাভ কি ? যা ঘটেছে সেটাই যথেষ্ট হয়েছে।

বাড়ি ফিরে এলে সারদা প্রশ্ন করে, 'কি জন্যে তোমাকে ডেকেছিল ? আর তোমার দেরি হওয়াতে....'

খাটিয়াতে শুয়ে ফতে চাঁদ বলল, 'মদে চুর হয় শয়তান বলে আমাকে গালাগালি করল ; অপমান করল। বারে বারে বলতে লাগল, দেরি কেন ? পিয়নকে বলল আমার কানটা মলে দিতে।'

সারদা রেগে বলল, 'কষে কয়েক ঘা জুতো মুখে বসিয়ে দিলে না কেন ?'

ফতে চাঁদ আবার বলতে শুরু করে, 'চাপরাশি লোকটা ভাল ; খুব সহজে নম্রভাবে বলল, হুজুর, সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মানহানি করার জন্য আমি চাকরিতে বহাল হয়নি। আর তারপর সাহেবকে সেলাম করে সে চলে গেল।'

'তার মধ্যে যথার্থই সাহসিকতা আছে। তোমার মনের জ্বালা সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে পারলে না ?'

'আমি কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছি। ছড়ি নিয়ে সাহেব আমার দিকে ছুটে এল। আমিও পায়ের জুতো খুলে ফেললাম, সে ছড়ি দিয়ে আমায় আঘাত করল আর আমিও পায়ের জুতো খুলে তাকে মারলাম।'

সারদা অবাক হল। সে বলল, 'সত্যি ? তার মুখটা দেখাবার মত হয়েছে।'

'তার মুখটা দেখে মনে হয়েছে, কে যেন মুখটা ঝাঁটা দিয়ে রগড়ে দিয়েছে।'

'খুব ভাল করেছ ! আমি ওখানে থাকলে বাছাধনকে আর বাঁচতে দিতাম না।'

'ভালইতো হল ! কিন্তু আমি যে তাকে মেরেছি। ব্যাপারটা অত সহজে মিটবে না। জানিনা কি ঘটবে। চাকরি তো যাবেই আর তার সঙ্গে হয়তো আমাকে জেলেও যেতে হতে পারে।'

'তোমার জেল হবে কেন ? জগতে কি বিচার বলে 'কিছু নেই ?' কোন

অধিকারে তোমাকে গালমন্দ করেছে? সেই তো প্রথম তোমাকে আঘাত করেছে? বল না করেছে কি না?'

'কেউই আমার কথা শুনবে না। বিচারকরাও তার পক্ষে কথা বলবে।'

'চিন্তা করো না। এখন থেকে দেখতে পাবে যে, অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করার সাহস কোন ইংরেজ অফিসার আর করবে না।'

'গুলি করে আমাকে মেরে ফেলতে পারত।'

'তাহলে তাকে দেখে নিত।'

মৃদু হেসে ফতে চাঁদ বলে, 'তাহলে তোমার অবস্থাটা কেমন হত?'

'ভগবান দেখত। মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ আত্মসম্মান বজায় রাখা। আত্মসম্মানই যদি না থাকে তাহলে পরিবারকে দেখাশোনা করার প্রশ্নই ওঠে না। শয়তানকে ঘা কতক বসিয়েছ জেনে তোমার জন্যে আমি গর্ববোধ করছি। আর যদি শুনতাম যে, তুমি নীরবে গালমন্দ হজম করে এসেছ তাহলে ঘৃণায় তোমার দিকে ফিরে তাকাতাম না। মুখে হয়তো কিছু বলতাম না কিন্তু মন থেকে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা চলে যেত।'

শান্ত হয়ে ধীর স্বরে সারদা বলে গেল, 'এখন যাই পরিণাম হোক না কেন হাসিমুখে আমি তা গ্রহণ করব। ওগো শুনছো? কোথায় যাচ্ছ এখন, শুনে যাও, শুনে যাও........'

উন্মত্তের মত ফতে চাঁদ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সারদা তার পেছনে পেছনে চিৎকার করে গেল কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। সে তখন বাংলোর দিকে যাচ্ছে। ভয় ডর বলে তার আর এখন কিছু নেই, তার গর্বোদ্ধত শির এগিয়ে চলেছে। মুখমণ্ডলে তার দৃঢ় সংকল্প। সে এখন এক রূপান্তরিত মানুষ। দুর্বল নির্জীব আপিস কেরানীর পরিবর্তে সে এখন এক কর্মঠ, নির্ভীক, বলশালী পুরুষ— এক উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে সে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে একটা বেশ শক্ত সবল লাঠি চেয়ে নিল। তারপর বাংলোর দিকে অগ্রসর হল।

রাত নটা। সাহেব ডিনার খেতে বসেছে। কিন্তু আজকে ফতে চাঁদ তার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। খানসামা খাবার পরিবেশন করে রান্নাঘরে ফিরে যেতে না যেতেই ফতে চাঁদ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। ইলেকট্রিকের আলোয় ঘর আলোকময়। কার্পেটে মোড়া মেঝে। এরকম সুন্দর মূল্যবান কার্পেট তার বিয়ের দিনেও জোটেনি। ভীষণ রেগে গিয়ে সাহেব তার দিকে তাকাল।

'বেরিয়ে যাও। বিনা অনুমতিতে কেন ঢুকেছ?'

ফতে চাঁদ শূন্যে লাঠি তুলে বলে, 'ফাইল চেয়েছিলেন, ফাইল এনেছি। খেয়ে নিন্, তারপর ফাইল দেখাব। ততক্ষণ এখানে বসেই অপেক্ষা করছি। বেশ ভাল খাবার। হয়তো এটাই আপনার শেষ খাওয়া।'

সাহেব ঘাবড়ে গেল। আধো ভয় আধো রাগে সে ফতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে লোকটা আজ মরিয়া। দৈহিক শক্তিতে দুর্বল হলেও আজ কিন্তু সে টিলের বদলে পাটকেল ছুঁড়তে এসেছে। পাটকেল না হয়ে আরও শক্ত সবল লোহা হয়তো হবে। সাহেব ভয় পেল। কুকুরকে মারা ততক্ষণই সহজ যতক্ষণ না সে ঘেউ ঘেউ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করা শুরু করবে সেই মুহূর্তে ঘাবড়ে যাবে। ঠিক এই অবস্থাই এখন সাহেবের। বুঝেছে যতক্ষণ ফতে চাঁদ নীরবে গালাগালি, এমন কি লাথিও সহ্য করেছিল তত-ক্ষণ সে রূঢ় ব্যবহার করেছিল কিন্তু আজকে ফতে চাঁদ অন্য এক মানুষ। মনের ভাবও সম্পূর্ণ আলাদা। বেড়ালের মত সব সময় ওৎ পেতে আছে। নজর রেখেছে সাহেবের চলাফেরা। সে জানে মুখ ফসকে কোন অপমান সূচক কথা বের হলেই তাকে লাঠির আঘাত পেতে হবে। সত্যিই তো, তাকে সে বরখাস্ত করতে পারে। হ্যাঁ, তাকে জেলে পাঠাতে পারে। কিন্তু তাতে, সে গালাগালি ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারবে না। তাই সে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের মত কৌশল অবলম্বন করে নম্রভাবে বলল, 'ভাই, আমার ওপর চটে গেছ মনে হচ্ছে? চটেছ কেন ভাই? তোমাকে কি আঘাত দিয়ে কোন কথা বলেছি?'

'আধ ঘণ্টা আগে আমার কান মলে দিয়ে নিরেট বোকা বলে গালাগালি করেছিলেন। এত সহজেই কথাগুলো ভুলে গেলেন সাহেব?'

'তোমার কান মলে দিয়েছি। ঠাট্টা করছ? তুমি কি আমায় পাগল ভেবেছ?'

'আপনার চাপরাশি সাক্ষী আছে। আর আপনার চাকরবাকরও তা দেখেছে।'

'কখন আবার এসব করলাম?'

'মাত্র আধ ঘণ্টা আগে। আমাকে ডাকিয়ে এনে কান মলে লাথি মেরেছেন।'

'সত্যি? বাবু, ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি তখন একটু নেশায় ছিলাম। খানসামাটা একটু বেশিমাত্রায় হুইস্কি ঢেলে দিয়েছিল। এখন আমার কিছুই মনে পড়ছে না। হায় ভগবান! আমি কি এসব করেছি?'

'মদে চুর হয়ে থাকা অবস্থায় যদি আমাকে গুলি করতেন, তাহলে তখন কি মরে যেতাম না? মাতালের সব কিছুই যদি ক্ষমনীয় হয় তাহলে আমিও তো এখন মাতাল। আর আমার অভিপ্রেত হচ্ছে এখন আপনি কান ধরবেন আর আমার কাছে প্রার্থনা করবেন। আর দিব্যি করুন যে, জীবনে আর কখনও

কারও সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবেন না। অন্যথা আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব। নড়াচড়ার চেষ্টা করবেন না। যে মুহূর্তে চেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা করবেন সেই মুহূর্তে মাথার খুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব। ধরুন, কান ধরুন এখন।'

সাহেব হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'বাবু, আপনি তো বেশ রসিক আছেন, তাই নয় কি? রূঢ় কথা বলে থাকলে ক্ষমা করুন আমাকে।'

'কান ধরুন!' লাঠিটা নাচিয়ে ফতে চাঁদ হুকুম করে সাহেবকে।

ইংরেজরা কখনই এরকম অপমান এত সহজে হজম করে না। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ফতে চাঁদের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিতে উদ্যত হয় সে। কিন্তু ফতে চাঁদ সতর্ক ছিল। টেবিল থেকে এগিয়ে আসার আগেই সে সাহেবের খালি মাথায় একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়। সাহেব বলল, 'তোমাকে আমি বরখাস্ত করব।'

'পরোয়া করি না। কিন্তু যতক্ষণ না নিজের কান মলছেন আর দিব্যি করছেন যে, কারও সঙ্গে এরূপ ব্যবহার আর কোনদিন করবেন না, ততক্ষণ আমি এখান থেকে আর নড়ছি না। যদি তা না করেন তাহলে দ্বিতীয় ঘুষিটা মাথায় পড়বে।'

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে লাঠিটা সে উচিয়ে ধরে।

প্রথম ঘুষিটার কথা সাহেব ভুলে যায়নি। তৎক্ষণাৎ সে কানে হাত দিয়ে বলে, 'এইতো ধরেছি। সন্তুষ্ট হয়েছ তো এবার?'

'কাউকে আর কখনও গালমন্দ করবে না তো?'

'না।'

'যদি কখনও কর তাহলে স্মরণ থাকে যেন আমি খুব একটা দূরে থাকছি না।'

"কাউকে কখনও গালমন্দ করব না।' ভাঙা ভাঙা হিন্দী ভাষায় সাহেব বলল।

'ভাল কথা। এখন তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আর এও জেনে রাখ যে, আজ থেকে আমি আর তোমার অধীনস্থ কেরানী নই। আসছে কাল লিখিত পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেব। এই কারণ দর্শিয়ে যে তোমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি আর তোমার অধীনে চাকরি করতে রাজী নই।'

'কিন্তু পদত্যাগ করবে কোন দুঃখে? আমি তো বরখাস্ত করছি না।'

'তোমার মত একজন দুর্ব্যবহারকারী লোকের কাছে আমি মোটেই চাকরি করতে ইচ্ছুক নই। সে জন্যেই চাকরিতে আমার ইস্তফা।'

আর এসব বলেই ফতে চাঁদ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর হাল্কা মনে সে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। তার চোখে মুখে এখন ফুটে উঠেছে প্রকৃত জয়ের এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ছবি। জীবনে সে আর কখনও এরকম স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি।

+×+